# কেন এই সৃষ্টি

**জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের**
**বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।**

**অভিনব দর্শন**

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*

**সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-**
শ্রী চপল মিত্র

**সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-**
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

**মুদ্রণে ঃ-**
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

**প্রথম প্রকাশ ঃ-**
১লা বৈশাখ, ১৪১৫
১৪ই এপ্রিল, ২০০৮

**প্রাপ্তিস্থান ঃ-**
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in
২) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক - বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬
৩) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

# পূর্বাভাষ

হে পথিক ভুলে যেও না, তোমরা বিরাটের সন্তান, স্রষ্টার সন্তান। রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যথা, জ্বালা-যন্ত্রণা, অভাব অনটনের জন্য অযথা প্রকৃতিকে দোষারোপ করো না। এদের সাথের সাথী করে জীবনের পথে জানতে জানতে এগিয়ে যাও। অভাবের মাঝে ক্ষণিকের পূর্ণতা, আবার পরিপূর্ণতার মাঝে অভাবের শূন্যতা, মৃত্যুর হাতছানি—এ খেলা প্রতিনিয়তই চলেছে প্রকৃতির মাঝে। রোগ, শোক, ব্যথা-বেদনা, এগুলি প্রকৃতির মহাদান। এইগুলি আছে বলেই দেহটা আমাদের টিকে আছে। আমরা ব্যথায় যন্ত্রণায় উঃ করছি, আঃ করছি আত্মরক্ষার জন্য।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে বাস্তব বিষয়বস্তুর মাধ্যমে প্রকৃতি নানাভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্যটি। সৃষ্টির উদ্দেশ্য গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই আমরা জানতে পারবো, কেন এসেছি? কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাব? প্রতিটি সৃষ্টবস্তুর ভিতর প্রকৃতির সমস্ত ক্ষমতা জাপ্য অবস্থায় বিরাজমান; শুধু ফুটিয়ে তোলার অপেক্ষায়।

অনন্ত প্রকৃতির জলে স্থলে অন্তরিক্ষে সর্বত্রই বয়ে চলেছে অজানা এক রহস্যের ধারা। জীব কেন জন্ম নিচ্ছে আর কেনই বা মৃত্যুকে বরণ করছে, আজও হয়নি তার সমাধান। আমাদের জন্ম কি শুধু খাওয়া-দাওয়া, সন্তানের জন্ম দেওয়া, হাট-বাজার করা, রেশনের থলি নিয়ে লাইনে দাঁড়ানো, আর বৃদ্ধ বয়সে রোগে শোকে ভুগে হা-হুতাশ করে চলে যাওয়া? শুধু এইটুকুর জন্যই কি এতবড় সৃষ্টি? তা কখনো হতে পারে? নিশ্চয়ই এর পিছনে বিরাট কোন উদ্দেশ্য আছে। কেন এই জীবজগতের সৃষ্টি? কে করলো এই সৃষ্টি? কে সেই স্রষ্টা? কি তাঁর স্বার্থ?

সৃষ্টি যখন হয়েছে, তখন তার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবেই। প্রশ্ন যখন রয়েছে, তার মীমাংসাও আছে। অপূরণকে পূরণ করাই সৃষ্টির ধর্ম। প্রয়োজন ছাড়া সৃষ্টি নয়। সৃষ্টির যদি প্রয়োজন থাকে রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যথার, তবে তার পশ্চাতে যে আর একটা সুন্দর সৃষ্টির ইঙ্গিত রয়েছে, তা বুঝে নিতে হবে। এটা কোন পাপ-পুণ্যের কর্মফল নয়।

সংসারের গণ্ডীর মধ্যে থেকে জন্ম-মৃত্যুর সীমানার মাঝে প্রকৃতির অনন্ত গতির সাথে গতি মিলিয়ে নিজ নিজ দেহবীণাযন্ত্রে সপ্তসুরের ঝঙ্কার তুলে খুঁজে বের করতে হবে সেই নিখোঁজের সুর। বের করতে হবে এই মহাসৃষ্টির অপার রহস্য।

যে জ্যোতি, যে আলো, যে ইচ্ছাশক্তি হতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, সেই সুর নিয়ে যিনি জন্ম থেকেই মহান হয়ে আসেন, সৃষ্টির সেই আদিশক্তি, সেই আদিতম বীজশক্তির পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে যিনি আসেন, তিনিই পারেন এই বিশ্ব প্রকৃতির অপার রহস্য উন্মোচন করে সহজ সরলভাবে তা সকলের কাছে পরিবেশন করতে।

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ সৃষ্টিতত্ত্বের বাস্তব বিষয়বস্তুর বস্তুত্বকে বুঝাবার জন্য কখনো ঘরোয়া পরিবেশে কখনও বা বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমতো তাঁর সেই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের ঊনবিংশ শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হল, **কেন এই সৃষ্টি**।

পরিশেষে জানাই পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রী অনির্বাণ জোয়ারদার, শ্রী দেবতনু চক্রবর্ত্তী, শ্রী সুজয় চ্যাটার্জী। এছাড়া যে সকল ভক্ত ও গুরুগত প্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫ — *চপল মিত্র*
ইং ১৪ই এপ্রিল, ২০০৮ — *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

# ভবিষ্যৎ যদি নাই থাকে, তবে অযথা চিন্তা ভাবনা, জ্বালা যন্ত্রণার কি প্রয়োজন?

**১৫ই নভেম্বর, ১৯৭২**
**শ্যামবাজার**

এই পরিদৃশ্যমান জগতে প্রকৃতির ধারাবাহিকতার ধারায় আমরা সুখের আশায়, শান্তির আশায় এগিয়ে চলেছি। বুঝেই হোক, না বুঝেই হোক, প্রত্যেকেই পরমানন্দের সাধনা করে চলেছি। তৃপ্তিই পরমানন্দ। বাস্তবের বিষয়বস্তুর ভিতর দিয়েই আমরা পরমানন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু পরিবর্ত্তে বেশী আসছে ব্যথা-বেদনা, রোগ শোক, দুঃখ-যন্ত্রণা। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে মনে, সৃষ্টি কি শুধু দুঃখ পাওয়ার জন্য? না, সৃষ্টির অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?

**জীবকুল এখানকার বিষয়বস্তুর ভিতর দিয়ে এখানকার শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে। সৃষ্টির নিয়মানুযায়ী যদি ভাব, তাহলে দেখবে, সৃষ্টির নিয়মে প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর ভিতরে ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে—পরপারের কথা।** ফুলের থেকে মধু পেতে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যাবে। কিন্তু মৌচাক থেকে মধু ঠিকই আহরণ করা যায়। সাধারণ সুর থেকেই অসাধারণ সুরে পৌঁছানো যায়। বিচার, বিবেক, বুদ্ধি দিয়ে যথেষ্ট খুঁজে নেওয়ার উপায় আছে। সামনে যা আছে, সেসব নিয়েই বিচার করো, সব কিছু সমাধান নিয়েই সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টির মুহূর্ত্তে জল, মাছ, গাছ কোথায় ছিল? কিন্তু ক্রমে ক্রমে সব আসছে। চাহিদা সব মিটে যাচ্ছে। তাই প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা সব আছে। এখন যদি বলো, অজানা দেশের চিন্তা কি করে করবো? সাধনা কি করে করবো? তাহলে বলতে হয়, শুধু সৃষ্টির ধারাপাতা ধরে ধরে এগিয়ে যাও। সারমর্ম বেছে নিতে পারবে। না পারার অবস্থায় সৃষ্টি কখনো হতে পারে?

প্রত্যেক গ্রহের সাথে গ্রহের, সকলের সাথে সকলের সম্পর্ক তৈরী হয়ে আছে। যন্ত্র ঠিকই আছে। শব্দ ঠিকই হয়। শুধু অভ্যাসের প্রয়োজন।



রেওয়াজ দরকার হয়। জগতের Harmony আমাদের সামনে আছে। সেই সুরে সুর দিয়ে সুরকে সাধতে হবে। আমাদের harmony উঠে পালাবার মতো। কারণ আমাদের সব বেসুরে চলছে। আমরা বিপরীত পথে চলেছি। যদি সুরে থাক, সুর সাধ তবে সুরেই সব তন্ময় করে দেয়। তোমার অক্ষমতা, তোমার defect যদি ধরতে পার, মেরামত করতে কতক্ষণ লাগে? এই জগতে সবাই harmony-র সঙ্গত করছে। ক্ষুধা ও তেষ্টা এক রকমের নয়। তেষ্টা পেলে সন্দেশ, রসগোল্লা খেলে তেষ্টা মেটে না। যখন যেটার প্রয়োজন সেটা না দিলে, ইন্দ্রিয়ের চাহিদা মেটে না। ক্ষুধা বা তেষ্টা না থাকলে জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা থাকতো না। ক্ষুধার একটা ডাক আছে। তখন জলে কাজ হয় না।

**রোগ শোকের জ্বালা একরকম। ক্ষুধার জ্বালা আরেকরকম। ভবিষ্যৎ যদি নাই থাকে, তবে অযথা চিন্তা-ভাবনা, জ্বালা-যন্ত্রণার কি প্রয়োজন? মেজাজ, রাগ, হতাশা, নিরাশা, এগুলো কিসের জন্য? কিসের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে দুঃখ-কষ্ট, অশান্তি, ঝঞ্ঝাট? অশান্তি, ঝঞ্ঝাট আমরা সব সময় এড়াতে চাই। আমরা তৃপ্তি চাই, শান্তি চাই। তখন ডাল, মাছ, ভাত চলে না। পরমানন্দের সুর ও সাড়া না পেলে তখন অন্য কোন জিনিসে চলে না।** তাই আমরা অনন্ত শান্তি পেতে চাই। এখানে অন্তর্যামিত্বহীন দেশে কেউ কারও কথা বোঝে না, কেউ কারও কথা বলে না। সৃষ্টির মাধুর্য, প্রকৃতির সুন্দর রূপ, এগুলো যখন আছে, এটাই বেদ। প্রকৃতির অনন্ত ধারাবাহিকতাই বেদ। কি সুন্দর নিখুঁতভাবে সৃষ্টির নিয়মে সবকিছু সাজানো আছে। সব কিছুরই প্রয়োজন আছে। এই দেহবীণাযন্ত্রে একটি লোমকূপেরও প্রয়োজন আছে। দুঃখ-ব্যথা বোধ আছে বলেই দেহটা টিকে আছে। হাত মোচড়ালে যদি উঃ না করো, তবে হাতের হাড়গুলো সব টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আমরা উঃ আঃ করছি আত্মরক্ষার জন্য।

অযথা প্রকৃতিকে দোষারোপ করা চলে না। চেতনার সুর, চেতনার ইঙ্গিত— এ কোথাকার ইঙ্গিত? সৃষ্টির প্রতিটি বিষয়বস্তু মীমাংসাতে ভরপুর হয়ে আছে। মহাশূন্যে অপূর্ণকে পরিপূর্ণ করার জন্য সবাই ধাইছে। প্রতিটি গ্রহ, নক্ষত্র অনন্ত মহাশূন্যে প্রচণ্ডবেগে ছুটে চলেছে। শূন্যের মাঝে পূর্ণ হওয়ার এই তাগিদ চলেছে চিরন্তন। এই পরিদৃশ্যমান জগতেও প্রতিটি বস্তুর

মাঝেই সেই ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়। **অভাবের মাঝে ক্ষণিকের পূর্ণতা, আবার পরিপূর্ণতার মাঝে অভাবের শূন্যতা, মৃত্যুর হাতছানি— এ খেলা প্রতিনিয়তই চলেছে প্রকৃতির মাঝে। পোলাও, মাংস, সন্দেশ, রসগোল্লা, লালমোহন; তারপরেও পান, লবঙ্গ, ধোঁয়া না পেলে অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। আর একদিন নেমন্তন্ন করে যদি শুধু লবঙ্গ দেওয়া হয়, তাতে কি পেট ভরলো?** শান্তি ভাল লাগতো না, যদি অশান্তি না থাকতো। বেদের আদি যুগের কথা জানা প্রয়োজন। শিব পার্বতীর কথাই শুধু ধর্মের কথা নয়। ধর্মের ভিত দরকার। বেদ হচ্ছে এমন একটি কাঠামো, যেটি তৈরী হয়ে গেলে কোন ভাবনা থাকে না। বেদের ভিত তৈরীর জন্য প্রস্তুতি দরকার।

বিবেকের নীতির কথাই বেদের সুরের কথা। বেদ প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের সাহায্য করছে। বাইরের রূপের মোহ থাকলে চলবে না। ছিঁড়ে ছিঁড়ে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। তাহলেই ভূত-ভবিষ্যতের সম্পর্কে সচেতন হয়ে যাবে। **প্রকৃতির ইঙ্গিত বুঝতে হবে। মৃত্যু হয়ে গেলে কাঁধে করে নিয়ে যায়। আর আমরা জীবিতাবস্থায় নিজ নিজ দেহকে, শবদেহকে বহন করে চলেছি। সচেতনের সুর চলে গেলে মৃতদেহ পড়ে থাকে। যিনি ছিলেন তিনি এখন আমাদের কাছে নেই। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করে দিলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না, এই দেহের মাঝে কে দেখতো, কে শুনতো, কে বুঝতো।**

আর আমরা যে, জীবিত অবস্থায় মৃতদেহ বহন করে নিয়ে চলেছি, তাতে যে আছে, আমাদের দেহে সে নিখোঁজ হয়েই আছে। নিখোঁজ হয়েই আমি আছি। 'আছি' বলে যাকে তোমরা মনে করছো, সেই 'আছি' কে আর খুঁজে পাচ্ছ না। এই দেহের মাঝে কে আছে, কোথায় আছে, কে দেখছে, কে বলছে, কে শুনছে কিছুই বোঝা যায় না। 'আছে' বলে মনে হয়, অথচ কি আছে, কোথায় আছে, তার হদিশ পাওয়া যায় না। আবার মহাকাশের অনন্ত সুরের কথা, অনন্ত চেতনার কথা খুঁজে পাই, এই দেহযন্ত্রের মাঝে। এই Radio-টা ছেড়ে দিলে খুঁজে পাই। তাই প্রকৃতির সুরে সুর মিলিয়ে চলতে হবে। অযথা প্রকৃতির উপর দোষারোপ না করে নিজেদের প্রকৃতির সুরে, তালে, লয়ে ভাসিয়ে দাও। তবেই পরমানন্দের সন্ধান পাবে। আজ এই থাক।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*



# যেখানে মৃত্যু আছে, সেখানে অদৃষ্টের কোন প্রশ্ন আসে না।

**১১ই নভেম্বর, ১৯৬৬**
**ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট্ হল, কোলকাতা**

সেখানে কোন বিবাদ নেই, মহাশূন্যে কোন বিবাদ নেই। বিরাট ব্যাপকতার সুর যেখানে, সেখানে কোন বিবাদ নেই। এই যে মন্ত্র, এখানে কোন বিবাদ নেই। এই সুর, এই নাদ আমাদের যে মন্ত্র, তাতে কোন বাদাবাদি নেই। এই বেদধ্বনি, মহাশূন্যেরই ধ্বনি। আমি সেই বেদের শ্লোক আওড়াচ্ছি। যেই সুরে সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে কোন বিবাদ নেই। **সমস্ত পৃথিবীর আদি জীবলোক, আকাশ, সবটা নিয়েই বেদলোক। এখানে কোন বিবাদ নেই। এক সুরে সাধনায় সবাই তন্ময়।** সেই সপ্তচক্র—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রার। এখানে সাধনার সুর বাঁধতে হয়। যেমন সরোদ শুনলে, সা রে গা মা পা ধা নি, তারই সুর, তারই গান। বহুদিন, বহুবার এই কথা বলেছি। তবে আবার বলছি। পুনরুক্তি করছি।

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর..... এক একটা চক্রের এক একটা মাহাত্ম্য, এক একটা সুর। সমস্ত আকাশ, ব্রহ্মলোকে এই সুর ব্যাপ্তমান। আজ দেশে এই যে অভাব অভিযোগ, মানুষ এত নীচে নেমে গেছে, একটু সুনাম করার কিছু নেই। আমরাই সরকার, সমস্ত জাতিবিরোধ, নীতি বিরোধ, সমস্ত ফাঁকি, কৌশল আমরাই করছি। আজ দেশে যে ধর্মের কথা চলেছে, আমরা যে ধর্ম ধর্ম করছি, ধর্মের গোড়াতেই গলদ ঢুকে গেছে। অনেকে গেরুয়া পরছে, মাথা মুণ্ডন করছে, তাতেই যে ধর্ম হয়ে গেল, তা নয়। বেদ তা বলে না। বেদের ব্যাখ্যা, সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা। ধর্ম গেরুয়ার উপর নির্ভর করে না। সন্ন্যাস আশ্রমের উপর নির্ভর করে না। তবে এরকম হচ্ছে কেন? সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ নিয়ে ধর্মের ভিতর গলদ ঢুকে গেছে। বর্ত্তমান সমাজে সাধু সেজে so-called (তথাকথিত) কতকগুলি লোক গুরুগিরি করে

লোকের মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। এসব যাতে না করতে পারে, তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, তারই বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করবো। সেই বেদের সুর যে সুরে সবাই আছি, সেই সুর বিস্মৃত হয়ে নিজ নিজ সম্প্রদায়কে বড় করবার চেষ্টাতে অন্যায়ের আশ্রয় নিচ্ছি। যেখানে জাতিভেদ, নীতিভেদ, তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। ধর্মে বৈষ্ণব, শাক্ত থাকতে পারে না। সাদা, কালো, থাকতে পারে না। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান থাকতে পারে না।

আজ এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়কে বড় মনে করতে পারে না। এক জাতি আর এক জাতিকে গ্রহণ করতে পারে না। এরা শাস্ত্রের নিয়মে যায় না। প্রকৃতির নিয়মেও যায় না। প্রায় সর্বত্র গলদ ঢুকে গেছে। বেশীরভাগই বিরাট বিরাট বাণী ছাড়ছে নেতা সাজবার উদ্দেশ্যে। আমাদের কর্তব্য একযোগে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। আমি আগেও চিঠি লিখে দিয়েছি, **সমস্ত সাধু সম্প্রদায়কে লিখেছি, ভারতবর্ষের সমস্ত সাধু আমরা সকলে যদি এক নীতিতে চলি, এবং সমস্ত সাধু যদি তাদের ভক্ত শিষ্যদের সেরূপ নির্দেশ দেন, জাতির কল্যাণে যদি আমাদের সর্বশক্তি ব্যবহার করি, তাহলে মনে হয় দেশে জাতির ভিতর কোন গোলমাল থাকবে না।** নিজেদের মধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মারামারি থাকবে না। কিন্তু আমার এই প্রস্তাবে কেহ সাড়া দেয় নাই। তাদের স্বার্থে ঘা লাগছে। আমি কোন সম্প্রদায় করতে চাই না। আমি নীতির সঙ্গে জাতির সঙ্গে এক যোগাযোগে থাকতে চাই। এক সুরে সবাইকে ডুবিয়ে রাখতে চাই। মূলাধারের মূলগ্রন্থিতে আছে যে সুর, যে আলোর প্রকাশ, গতির প্রকাশ, জ্ঞানের প্রকাশ, সেই মূল গ্রন্থিতে রয়েছে যেটা, সেটাই প্রস্ফুটিত হয়েছে সহস্রারে। **আমাদের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে গ্ল্যান্ডে যে অনুপরমানু আছে, তার যে ক্রিয়াবিধি, ধর্ম-কর্ম, তা কখনও অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে না। যেখানে মৃত্যু আছে, সেখানে অদৃষ্টের কোন প্রশ্ন আসে না, সেটা কথার কথা। আমরা যোগাযোগ সূত্রে নিজের সুরকে যদি বাঁধুনিতে আনতে পারি, তবেই কাজ হবে।**

আজ দেশের যে অবস্থা, তার জন্য দায়ী সরকার। আমাদেরই সরকার। আমরাই দায়ী। আমরা কোন কাজই সুষ্ঠভাবে করছি না। যার কাঁধে যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব তারা সুন্দরভাবে পালন করছে না। তারজন্য তারাই দায়ী। যাতে সমস্ত জাতি খেয়ে পরে থাকতে পারে, তা তারা করবে না। তারা



সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ কাজ করে চলেছে। যে সত্যি কথা বলবে, তাকে পুলিশে নিয়ে যাবে। যা ইচ্ছে অন্যায় ব্যবহার করবে। দেশে আজ এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে। দেশের কোন কাজই হয় না এতে। যারা ধর্মের লাইন ধরেছে, তারা লাঠি দিয়ে সব ঠাণ্ডা করবে। লাঠি হাতে করে সব পিটিয়ে ঠিক করা দরকার। এটা ধর্মের কথা, বেদেরই কথা। আজ কালীপূজা। কালী অস্ত্র ধারণ করেছে; রক্ত পান করছে। সেই বেদ বলছে, হে জাতি, তোমরা নীতির উপর দাঁড়িয়ে, এই মাটির উপর দাঁড়িয়ে প্রথম দাও জ্ঞানের বাণী। তাতে কাজ না হলে ধর অস্ত্রের বাণী। আমরা ভোটের জন্য লড়াই করবো না। ন্যায় নীতির বিরুদ্ধে যে কথা বলবে, তারই বিরুদ্ধাচরণ করবো। সে যেই হোক, মা-ই হোক, আর ভাই হোক, তার বিরুদ্ধে আমরা। তারা যে নীতিতে, যে দুর্নীতিতে চলেছে, তারই বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। **আজ যা চলছে, এরচেয়ে বেশী অপরাধ হতে পারে না। তারা অপরাধ করছে। সাথে সাথে আমরাও অপরাধ করছি। কারণ আমরা সহ্য করছি। তাই আমরাও দায়ী। কাজেই এরজন্য বিপ্লব আনতে হবে। সেই বিপ্লব জ্ঞানের বিপ্লব বা বুদ্ধির বিপ্লব। তা না হলে অস্ত্রের বিপ্লব আনতে হবে।** যেখানে যেমনভাবে করা দরকার, আমরা সেইভাবেই করবো। তাতে যা হয় হবে। যা খুশী চলতে দেওয়া যেতে পারে না। কেন যে একটা লোক মাথা তুলে দাঁড়িয়ে কাজ করতে পারে না। এই চূড়ান্ত দৈন্য অবস্থা, এমন অবস্থা দেশের কেন হবে? দেশে খাদ্যের অভাব নেই। প্রচুর খাদ্য রয়েছে। আমরা পাচ্ছি না কেন? যারা লক্ষপতি তারা আটকিয়ে রেখেছে। আমাদের ধর্মের অঙ্গ সংসার। স্ত্রী, পুত্র, মা, বাবা সবাইকে নিয়েই যে সংসার ধর্ম, তা আগে বুঝতে হবে। সেই বেদের সুরে যে মূলাধারের কথা বললাম, প্রতি স্তরে স্তরে তার একটা ভাষা আছে। ভাষা শিখবার জন্য যেমন অক্ষর আছে, বিশ্বের ভাষা শিখবার জন্য সেইরূপ অক্ষর আছে। **বিশ্বের সুর মূলমন্ত্রকে প্রণব বলেছে। সব সুর যদি একসুরে হয়ে যায়, যেকোন ব্যক্তি যে কোন অবস্থায় যদি সুরের সাধনা করে, যদি তন্ময় হয়ে যায়, সে যা খুশী তাই করতে পারে। এমন সুন্দর জিনিস রয়েছে প্রকৃতির মাঝে।** জগতে যদি কোন সহজ কাজ থাকে, সেটাকে সবচেয়ে কঠিন বলে ধরে নিয়েছে। আমাদের চলার পথে যদি একটু চেষ্টা করি, হয়ে যায়।

এই জগৎ সৃষ্টির আগে কি ছিল? কেন এই সৃষ্টি? তাঁকে কে সৃষ্টি

করলো? ভগবানকে কে সৃষ্টি করলো? একদিকে ফাঁকা, একদিকে বস্তু। ফাঁকা যেভাবে এল, বস্তুও সেভাবে এল। ফাঁকাতে কি করে বস্তু রয়েছে? একটা কথা বলবে, বস্তু দাঁড়িয়ে যাবে। ফাঁকা জায়গায় আছে বলেই স্পীড (Speed) আরম্ভ হয়ে গেল। বস্তু পূরণ করতে চায় বলেই দ্রুতগতিতে ঘুরছে। আমাদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা বৃত্তির নিবৃত্তি করছি। বৃত্তি নিবৃত্ত হচ্ছে, তবে আবার জাগছে। পূরণ আর হচ্ছে না। কাজেই **আমরা শূন্যের ভিতর আছি বলেই পরিতৃপ্তি আর হচ্ছে না। পরিতৃপ্তি যে হচ্ছে না, তার কারণ সবাই মহাশূন্যে রয়েছি। আমরা সবাই মহাশূন্যের প্রভাবে রয়েছি। অপূরণ পূরণ হলে ফাঁকাও পূরণ হবে। কিন্তু ফাঁকা কোনদিনই পূরণ হবে না।** সূর্য উঠবার আগে যে আভাষ, তাতে এই ইঙ্গিতই দিচ্ছে যে, মহাশূন্য চিরকালই ফাঁকা। তবু যে চেষ্টা আমাদের চলার পথে, আমাদের এই অপূরণকে পূরণ করার ইচ্ছা সম্পূর্ণ জাগ্রত বলেই এরূপ হয়ে যাচ্ছে। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। জীবজগতের সবাইকে এক পথের পথিক করছে এই স্পীড, এই গতি।

এই জীবলোকে ইন্দ্রিয়ের যে লোভ, লালসা, যে পরিতৃপ্তির কথা বলি, আমরা যে তৃপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছি, এটাই প্রকৃতির স্বভাবজাত নিয়ম। এরজন্যই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ক্ষুধা নিবারণ করবার জন্য কত ফন্দি ফিকির করছি। রোজগারের এই চেষ্টা আছে বলেই নানাপথে অগ্রসর হচ্ছি। এই পথটা আছে বলেই যোগীরা সাধনা করছেন। 'হে ভগবান', ব'লে আমরা গভীর তৃপ্তির সাধনা করছি। যেভাবে হোক, যেভাবে করুক, এটাই সাধনা। বর্ত্তমান সমাজে তথাকথিত সংস্কারগত যে সাধনা আছে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেটা কল্পনায় চলে গেছে। ধর্ম মনগড়া হতে পারে না। শাস্ত্রের কথায়, উবাচ আর ভাষ্যে ধর্মকে বিকৃত করা হয়েছে। সৃষ্টির যে নিয়মকানুন, যেখানে যতটা প্রয়োজন, সেখানে ততটা তৃপ্তির নিয়মে সব তেমনি সাজানো। সেখানে যদি কেউ বলে, মাথার পিছনে দুটো চোখ আছে, তাতো হতে পারে না। **এত যিনি সজাগ, কেবল তাঁকে পাবার বেলায় কঠিন, কখনও তা নয়। যাতে সবাই বিরাট পথের পথিক হয়, সেই চেষ্টাই চলেছে। বিরাট বস্তুর সঙ্গে যোগযোগ করা এবং যোগাযোগ করানো, এটা বিরাটেরই কাজ। সেইভাবে পথ রয়েছে, সেইভাবে মত রয়েছে। সেই যোগসূত্র ধরে এগিয়ে যাও।** তবে আমরা সেভাবে যাই না কেন? কারণ এসব বললে আর গুরু মহান সাজা



যায় না; দল, সম্প্রদায় থাকে না। আমরা যদি সত্যিকারের প্রকৃতির পথ বুঝে বুঝে চলি, তবে বোধহয় কোন গুরু, মহান টিকবে না। থাকবে না কেন? শিক্ষক থাকবে না কেন? সন্তান এলেই মায়ের বুকে স্তনে দুধ আসে। শিশু, (বাচ্চা) যদি মায়ের স্তন পান না করে, মা বাঁচে না। তৃপ্তি শুধু বাচ্চাই পায় না, মাও পায়। **একদিকে মা স্তন দিয়ে আমাকে (বাচ্চাকে) রক্ষা করেছেন, আবার আমি স্তন খেয়ে মাকে রক্ষা করেছি। আমি স্তন পান করেছি বলেই মা বেঁচে আছে। কেউ বলতে পারে না, আমি না হলে তোমার চলবে না। সৃষ্টির নিয়মই হলো সমতা রক্ষা করে চলা। উভয়পক্ষের সমতার সুর রেখে যোগাযোগ রাখাই যোগ।** আমরা (বাচ্চারা) যদি স্ট্রাইক, (strike) করতাম, 'আমরা গর্ভ হতে বার হবো না', তাহলে কি হ'ত? সবাই অস্থির হয়ে যেত। এটাই যে তৃপ্তির নিয়ম, আমিও খালাস হচ্ছি, মাও খালাস হচ্ছে। মা বলছে, আমি যদি না খাওয়াতাম, তুই কি করে বাঁচতিস্?

—'এমন কাঁদতাম' (বাচ্চা বলছে), কারও না এসে উপায় নেই। রাত্রিতে বাচ্চা কাঁদলে যেকোনভাবে ঘুম পাড়াচ্ছে। তা না হলে সবার ঘুম বন্ধ হয়ে যেত।

**সৃষ্টির নিয়ম হল, কেহ একচ্ছত্র কথা বলে চলে যেতে পারবে না। গুরু যদি বলে, আমি তোমাদের রক্ষা করছি, তা হয় না। বেদের কথায়, আমি যদি বলি, 'রক্ষা করছি, মুক্তির সাধনায় সবাইকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি,' এটা আমার বলা নয়।** বেদের সুরে এই কথাটা বলতে বাধ্য। একজনের অভিজ্ঞতা যখন আসবে, বাধ্য হয়েই আর একজনকে শিখাবে। ছেলে ভুল পড়লে, বাবা বলবে, 'এটাতো এই নয়।' বাবা সংশোধন করে দেবে। প্রকৃতির নিয়মেই প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহযোগিতায় আসবে। প্রকৃতির নিয়মই এটা। এই বুদ্ধিগুলি কোথা থেকে আসছে? সবাই সবার সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রত্যেকের অভাব মিটিয়ে নিচ্ছে। এটাই বেদের কথা। আমি না খেয়ে মরলে, ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাব না। আবার বিষ খেয়ে যদি মরি, তাহলেও যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। আমাদের উপর সেই অন্যায় অবিচার হচ্ছে। আমরা অন্যায় করতে দ্বিধা করছি না।

**আমরা যে পথে চলেছি, যে সুরের সাধনায় যে মন্ত্রের সাধনায়**

**চলেছি, এটাই যেন জীবন যাত্রার পথে সম্বল হয়। আমরা সেই কথাই বলছি। এটাই নাদধ্বনি, সবটাই নাদ। আমরা যে পথের পথিক, সেই সাধনাই করা উচিত। সুরের সন্ধান পেলেই আলোর সন্ধান পাওয়া যায়। সেইভাবেই বলা হয়েছে। জপতপের পথে চললে আলো প্রস্ফুটিত হয়। ভিতরের সত্তা জাগরিত হয়।** আগেই বলেছি, ধর্মের প্রকৃত অর্থ আজ বিকৃত হয়ে গেছে। চারিদিকে ধর্মের নামে যা চলছে, আজকে পরিস্থিতি যা হয়েছে, তাতে ধর্মের উপর বিশ্বাস কারও থাকতে পারে না। এরফলে সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। নৈতিক ভিত্তি নষ্ট হয়ে গেছে। দেশে উচ্ছৃঙ্খলতা এসেছে। এরই প্রতিকারের জন্য চাই প্রকৃতির বিপ্লব, জ্ঞানের বিপ্লব, বাঁচার বিপ্লব, বাঁচানোর বিপ্লব, বেদের বিপ্লব। আজ এই থাক।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*



# এই সংসারই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত সৃষ্টি তত্ত্ব

**১০ই জুলাই, ১৯৫৮**
**বর্ধমান**

এত তত্ত্ব বলা হয়েছে যে, কোনটা বলতে হবে, কোনটা বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে, ঠিক করে উঠতে পারি না। নাদই চলছে কি? একটা জিনিস চলছে সদাসর্বদা। সেটা হল, যে তত্ত্ব বলা হয়, যা তোমরা মন দিয়ে শুনছো এবং শুনবে, প্রতিটি তত্ত্বই এক একটি স্তর হতে বলা হয়। তাই তত্ত্বের যে স্তর, আলাপের যে স্তর, যে যে স্তর হতে কথাগুলো বলা হয়, তোমাদের মন সেই সেই স্তরে চলে যায় বলেই সেই স্তর হতে তোমরা শুনতে পাচ্ছ। একটা জিনিস বারবার শুনলে মনের বাঁধুনিটা সেইভাবে গাঁথা হয়ে যায়। সাধারণভাবে স্বাভাবিকভাবে আমরা মনের বিভিন্ন স্তর নিয়ে চলেছি। সংসারে দৈনন্দিন জীবনে যে স্তরে কথা বলা হয়, ঠিক সেখানে মনটা নিয়ে গিয়ে তোমরা শুনতে পাও। তাতে কাজটা কি হয়? **মনটাকে সেখানে রাখলে স্বাভাবিকভাবে মনটা যে চলছে, সেই চলমান মন এক জায়গায় নিবিষ্ট হয়ে কথাটা শুনলো। তাতে একটা জিনিস বুঝা যায়। মনটা ঘুরে ফিরে এখানে সেখানে বসতে চায় না। জায়গামত গিয়ে বসতে চায়।** ওদিককার সব এখানে— এখানে নিয়ে এসে ফেলে ওদিককার সব। এই অফিস, ঘরবাড়ি টাকা রোজগার, দেবতা থেকে আরম্ভ করে ঠাকুরপুজো পর্যন্ত সবই যেমন করে, সেখান থেকে এখানে মনটা এনে ফেলে। এখন যেটা আলাপ করছি, সেটায় তোমাদের মন আছে, না এখানে আছে? এই সংসার বাড়িঘর তোমাদের ঘর, না ওটাই তোমাদের অফিস? কোনটা অফিস? এখন এই যে তোমাদের সুরের কথা বলছি, সেটাই তোমাদের ঘর। কতদিন ক্লাস করছি, কত তত্ত্ব বলছি; আবার বাড়ী গিয়ে সব ভুলে গেছ। এইটার কি উপায় আছে?

কত নাদ, কত শব্দ, কত ধ্বনি, কত কথা, এগুলি কি করে মেশে? অনেকে বলে, এটার কি প্রতিবিধান? তুমি ঘর থেকে বের হলে, ব্যবসা-বাণিজ্য করলে, কাজকর্ম করলে। **সংসারে দাসদাসী, স্ত্রী, ছেলেপুলের জন্য কত কি করতে হয়। তোমরা কত কি না কর। এমনকি টাকার জন্য পকেট মেরে জেল হাজত পর্যন্ত যায়। এদিক দিয়ে তো সংসারের কাজের প্রতি তোমাদের নজর আছে। কত ছলবল কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছ। কত অসুবিধা ভোগ করে বাচ্চাকে খাইয়ে পরিয়ে সংসার চালাচ্ছ। সত্য মিথ্যা করে কত রকম চলছে।**

তোমাকে যা (তত্ত্ব) বলেছিলাম, এখন ডিসপেপ্‌সিয়ার ঢেকুর উঠছে। বহু তত্ত্ব বলা হয়েছে। ভাল জিনিস বেশী হজম হয় না। ভাল ঘি বেশী খাওয়া যায় না। হজমের জন্য তো কিছু করা দরকার। হজম হওয়া চাই। তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি অনর্গল বলে গেলাম, তুমি শুনলে; তাতে কি হল? সেই ডিসপেপসিয়াতে বমিটমি হয়ে গেল। হজম আর হলো না। দুধ যদি ঢেকুর হয়ে ওঠে, তবে তো সাংঘাতিক।

**হজমের জন্য কিছু খাওয়া দরকার। পথ্য যাহার বার্লি, তাকে ভাল দুধ দিলে হজম করতে পারবে না। সেই দুধ ঢেকুর হয়ে উঠে যাবে। এতো বড় সাংঘাতিক কথা। তাহলে হজম শক্তি বাড়াতে হবে।** ঘুম থেকে উঠেছ। বাবা বললেন, 'ভাল ঔষধ দিলাম। চিরতা খাও।'

তুমি মুখ বিকৃত করলে, ভেটকি দিয়ে উঠলে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কোন অসুখ ভাল করতে গেলে তার যে ঔষধ, সেটা সুবিধার হয় না। ঔষধ খেতে তিতা টিতা হয়। কিন্তু হজমের জন্য ইহাই ব্যবস্থা। এইরূপ ঔষধেরই প্রয়োজন। আবার ঠিক হয়ে গেলে দেখা গেল, রাস্তার পেঁয়াজের বড়া, চানাচুর, যা কিছু খাও, হজম হয়ে যাবে।

এই সংসারে ঝড়ঝাপটা, আবিলতা, রোগ, শোক সবসময়েই ঘিরে রয়েছে। আমি এত হরেক রকমের রোগ পেয়েছি, মনের ব্যাধি পেয়েছি যে, হাসপাতালও fail করে গেছে। তাহলে বাইরে যে সমস্ত সমস্যা আছে, সেই সবরকম জটিলতার আসান (সমাধান) বা প্রতিবিধান কি?

এই যে মন, এই যে প্রাণ, এই যে অন্তর কিভাবে তাকে বোঝানো



যায়? তত্ত্বকে কিছুতেই উপলব্ধিতে প্রবিষ্ট করানো যায় না। ভিতরে উপলব্ধি কি করে করা যাবে?

বেশীরভাগ মানুষই একই কথা বলে যে, কিছুতেই মন বসে না। কাজ করি, জপ করতে বসি। মন কোথায় ছুটে পালায়। হাটে বাজারে মন ছুটে পালাচ্ছে। ছেলে মেয়ের কথা ভাবছে। আবার মশার কামড়, মাছির কামড় খাচ্ছি। এদিক দিয়ে চ্যাঁ ভ্যাঁ। তাগাদার পর তাগাদা করতে এল। কোনদিকেই কোন সুরাহা নাই। এইভাবেই কি শেষ নিঃশ্বাস ফেলে চলে যেতে হবে? তবে কি এই আমাদের শেষ পরিণতি? কিন্তু তাতো হতে পারে না। তবে কোন্‌টা ঠিক?

**সংসারে এতসব ঝামেলা। সবাই যেন হাবুডুবু খাচ্ছে। তার মাঝেই বিরহের গান, ভক্তিমূলক গান গাইছে। কত ভালোলাগা, কত ভালবাসা, সবই সাময়িক।** পরে আর থাকে না। বহুরকম শাস্ত্র, বেদ পুরাণ, আর ভাগবতের ভক্তিমূলক বাণী শুনে যেন পান করছি, ভাল লাগছে। এতে কোন রস, কোন তত্ত্ব আছে? যেন কোকেনের নেশায়, মরফিয়ার নেশায় ঝিমুচ্ছে। কোকেন খেয়েও ঝিমায়। আবার না খেয়েও ঝিমায়। **কোকেনের নেশা যখন ছাড়িয়ে যায়, নেশাখোর তখন কি করে? বাক্স করে বাচ্চা সাপ নিয়ে এসে তার ছোবল খায়। বুঝতে পেরেছ, নেশার কি অবস্থা। ১/২ টাকা দিয়ে ছ্যাঁপ করে জিহ্বার আগায় ছোবল মারে। যে সাপকে ভয় করে, সেই সাপের কাছ থেকেই ছোবল নেয়। ছোবল নিয়ে এই নেশাকেই কায়েম করে। আমাদের কোন্ নেশায় থাকা দরকার? আমাদের এমন নেশায় থাকা দরকার যে নেশা আর যায় না, যে নেশায় আমরা মজতে পারি। আফিং খেলে চলবে না। আবার নেশা এমন করতে হবে, যেটা হবে স্বাভাবিক সুরে। যেমন রোগ হচ্ছে, রোগের উপশমও হচ্ছে। ক্ষুধা হচ্ছে, আহার করছি। এইভাবে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যা চলছে, সেই নিয়মাবলীর মধ্যে এমন নেশায় মশগুল হতে হবে, যাতে আমরা মজতে পারি। যে নেশায় ভরপুর হতে পারলে ভিতরের গ্ল্যান্ডগুলো সব প্রস্ফুটিত হয়ে যাবে।**

এখানে সংসারে আমরা যা করছি, অহর্নিশ যেভাবে চলছি, কিসের নেশায় বশীভূত আছি? ঠার্কুদা ছিলেন, বাবা এলেন। ছেলের পরে ছেলে

এল, সন্তানের পর সন্তান। রোজগার করলাম, খাওয়ালাম, এই যে চলেছে, এটাই কি সৃষ্টির উদ্দেশ্য? **আমাদের প্রত্যেককেই প্রতিটি জিনিসের কারণ খুঁজতে হবে। সংসারে এই ধারার কারণ কি? কোন্ মহৎ উদ্দেশ্যে এই জগৎ সৃষ্টি হলো?** অগণিত বাবা গেল, ঠার্কুদা গেল, তার বাবা, তার বাবা গেল। আমিও যাব। এটা কর, সেটা কর, ঘর কর, বাড়ী কর, খাও, শান্তিতে থাক। এই জাতীয় ভাব বা policy বা একটা কাজই কেন সংসারে সবাই করছে? সব জীবের মধ্যে এক জাতীয় ভাবই যে চলছে, সেতো দেখতেই পাচ্ছ। সকলেই যেন টোকাইতে (কুড়াতে) আছে। কাঠঠোকরা গর্ত করছে, বাবুই পাখী বাসা বানাচ্ছে, বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে। এক বিরাট ব্যস্ততার মাঝে সবাই চলেছে। এই চলার পিছনে যেন সকলে চলে যাচ্ছে। সন্তান হচ্ছে। তাকে খাওয়াবার জন্য, লালন পালনের জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। ওঠা, বসা, যাওয়া একটা ভাবই চলেছে সবার মাঝে। এই জন্মাচ্ছে, এই মরছে। এর শেষ কোথায়? এই সৃষ্টির কারণ কি?

**একটা জিনিস থাকলে আর একটা জিনিস থাকতে হবেই, ইহাই নিয়ম। আবহমানকাল থেকে সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারা যে চালাচ্ছেন এবং নিজেও চলছেন, তাঁর কি ইচ্ছা যে, আমরা কেবল আসবো আর যাব?** বীজ পুঁতলে গাছ হলো। তাতে ফুল ফল হলো। আবার বীজ, আবার গাছ ... এর কি উদ্দেশ্য? স্রষ্টা যে নিয়মের মাঝে চলেছেন, সৃষ্টি করছেন, এই কি তাঁর ইচ্ছা যে, শোক পাব, ব্যথা পাব, রোগে যন্ত্রণায় শেষ নিঃশ্বাস ফেলে চলে গিয়ে আবার দেহ নিয়ে আসবো? একবার দেহ ছেড়ে মিশে গিয়ে আবার রূপ নিয়ে আসবো, শুধু এইটুকু উদ্দেশ্যের জন্য এতবড় জীবজগৎ চলতে পারে না। তবে শেষ কোথায়?

**শেষ নিঃশ্বাস ফেলে দিলাম। তারপর হল কি? চলে তো যাচ্ছি। মৃত্যুর সাথে সাথে অগণিতভাবে যাচ্ছি। আবার অগণিতভাবে আসছি। ঠিক যেভাবে যাচ্ছি, সেইভাবেই কি আসছি? না, নতুন করে অন্যভাবে আসছি?** (কি করে আসছি, এখন থাক সেটা) তবে এসেছি, এটা তো ঠিক? কত জীব জগৎ চলে যাচ্ছে। কোথায় চলেছে? আবার যে আসছে, কোথায় এল? এই যে অহর্নিশ নানারূপে আসছে, আবার শেষ নিঃশ্বাস ফেলে চলে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে? যেটা চলে যাচ্ছে সেটাই এল? না, আর একটা নতুন করে



এল? (এটা বলবো না)। যা সহজে বুঝা যায় না, সেটা বলা হলো আইন বিরুদ্ধ। সেটা বললে তোমাদের বোধগম্য হবে না। অগণিত জীবকুল এই যে আসছে, এত প্রাণের সমষ্টির সংমিশ্রণে সম্মিলিত প্রাণ কোথা থেকে আসছে? এই যে অগণিত রূপ কোথায় এর ভাণ্ডার? নিশ্চয়ই এমন এক ভাণ্ডার আছে, এমন এক জায়গা আছে, যেখান হতে এক সুন্দর নিয়মের ধারায় সবকিছু চলছে; এক অদ্ভুত ভারসাম্য বজায় রেখে সবকিছু হয়ে চলেছে। প্রচণ্ড উত্তাপে পুকুর, নদী, খালবিলের জল শুষে নিয়ে যায়। নেওয়ার সময় দেখা যায় না। আবার বৃষ্টি হয়ে ঝরে পরবার সময় দেখা যায়। তবে কি উপায় হতে সৃষ্টি হচ্ছে? জল গরম করলে বাষ্প হয়ে উঠে যায়। নিদাঘের রাগে জল যে বাষ্প হয়ে উঠে যাচ্ছে, তা দেখা না গেলেও উপলব্ধি করা যায়। নানাভাবে রান্না করলে দেখা যায়, বুঝা যায় যে, জিনিসগুলি আর একটা রূপ নিয়ে আসে। পুকুর, খাল, বিল, ডোবা সব পড়ে রয়েছে, শুকিয়ে যাচ্ছে সব— আবার যখন বৃষ্টি হল, অগণিত ধারায় দেশ ভাসিয়ে দিল। আর একটা নতুন রূপ নিয়ে এল।

কুকুর মরে রয়েছে, শুটকি মাছ শুকিয়ে মরে রয়েছে, পুকুর, মাঠ, ঘাট শুকিয়ে রয়েছে, আবার যখন জলে দেশ ভেসে যাচ্ছে, গাছ হয়ে ফলে ফুলে ভরে যাচ্ছে। এইরূপ শুকিয়ে নেওয়ার কারণ আছে। একটার জন্য আর একটার প্রয়োজন আছে। একটা গিয়ে, আর একটা এলো। মেঘ বাতাসে বাতাসে তো ঘুরছেই। ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়েই ধাক্কা খাচ্ছে আর বৃষ্টি হচ্ছে। পাহাড়ে গিয়ে ঝরণা হয়ে হু হু করে নেমে এল। এই বৃষ্টি হতেই গাছপালা, খাদ্য। এই যে আমরা চলছি, মৃত্যু হচ্ছে আবার আসছি, এওতো একটা বর্ষণেরই ফল। হু হু করে চলে যাচ্ছি। একবার বাষ্প, একবার জল, একবার বরফ। আবার বাষ্প, আবার জল, আবার বরফ। আমরাও সূর্যের কিরণের টানের ঠেলায় বৃষ্টি হয়ে পড়ছি। হু হু করে চলে যে যাচ্ছি, একটা টানেই তো যাচ্ছি।

**একটা টানে তো যাচ্ছি নিশ্চয়। এই সূর্যের টানে না হলেও আর একটা সূর্যের টানে বাষ্প হয়ে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি? কোথায় যাচ্ছি, তা জানবার দরকার নেই। তবে যাচ্ছি, আবার বের হয়ে আসছি। এই যে অগণিতভাবে প্রত্যেকে সংসারে এসেছ, এর কারণ তো আছে। এই**

**যে সংসারে চলছি, ঘুরছি, হাসছি, কাঁদছি, ছেলেমেয়ের বিয়ে দিচ্ছি; পরিণতি যে মৃত্যু, জানে সবাই, নিজেরাই বুঝি। বুঝলাম, জানলাম। প্রত্যেক জিনিসটাই যে সৃষ্টি হয়েছে, একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। সকলেই দেখছি, মনে হয় বুঝছি কিন্তু জানতে পারছি না, প্রকৃত উদ্দেশ্য বা কারণ।**

**চায়ের দোকানে বসে অনেকে বলার সময় বলে, 'আর ভাই, কদিন? যেতে তো হবেই।' বললো তো ঠিকই কিন্তু মৃত্যুর গাঁথনিটা পাকা হলো না, ভিতরে বিঁধলো না। মৃত্যু আছে সবাই জানে। কিন্তু ভিতরে পিনের মত বিঁধছে না।** এই জানাটাই জানা হলো না, দেখাটা দেখা হল না, বুঝাটা বুঝা হলো না, দেওয়াটা দেয়া হলো না। শ্মশানে গেল। একটার পর একটা নিয়মের মাঝে চলতে লাগলো। মৃত্যুর ভয়ে অস্থির। একলা চলতে পারে না। এমন লোক খুব কম আছে যে একটা মরা নিয়ে ঘরে একলা বসে থাকতে পারে। মরা নিয়ে কি কেহ ঠাট্টা করতে পারে? এই চিন্তাই করতে পারে না। চিন্তা করলেই অস্থির হয়ে যাবে। ঘরের মধ্যে দেখলেই বাপরে বাপ।

কাজেই দেখা গেল, **যাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসলে, তাকে আর মৃত্যুর পর ভালবাসতে পারো না। সেই মৃতদেহ ছুঁলে স্নানটান করে শুদ্ধ হতে হয়। কয়েকদিনের মরা হয়ে গেলে নাকে কাপড় দেয়। আমরা কি ভালবাসি?** আমরা ঠিক ভালবাসি না। মৃত্যুর পর সে যদি আবার ডাক দেয় রাত্রিতে, তবে চিৎকার করে অস্থির করে তুলবে। ঘরের মধ্যে ফটো দেখলেও ভয় পায়। **যারে এত ভালবাসলাম, যারে কেহ ঘৃণা করলে আমি বকতাম, এখন কিন্তু তাকেই ভয় করছি। ডাকডুক যদি দেয়, সেইজন্য লোহা, তাবিজ, কবচ ইত্যাদি পরে তার হাত থেকে রক্ষা পাবার, তাকে তাড়াবার ব্যবস্থা করি। এই হলো আমাদের ভালবাসা, আমাদের প্রেম। যাকে আমরা ভালবাসি বলে ঘর সংসার করছি, সেটা আমাদের ভালবাসা নয়। যাকে ভালবাসি, তাকে সবসময় ভালবাসবো।** যে ছেলেকে কতই না ভালবাসলাম, তার জন্য কতই না করলাম। এই স্বামী তাকে কতই না ভালবাসলাম, সবই এক পর্যায়ে (মৃত্যুতে) খতম। কাজেই দেখা গেল, এই সংসারে যে যা করছি, শুধু করছিই।



জীবিত অবস্থায় যাকে ভাল লাগে, কই তার 'কফ' তো ভাল লাগে না। আমার খোকার ময়লা কত আদরের। কই, তাতো বল না। তাহলে কি হলো? কৃমি ভালবাসো খোকার? না, তাহা ফেলে দাও। তাহলে কি ভালবাসি আমরা? কি করছি আমরা, তার ভিতরকার রহস্য জানা দরকার। মনন যন্ত্র ফিট করেছি যখন, তখন জানতেই হবে। স্বামীর একখানা ফোঁড়া হয়েছে, তার পূঁজ ভালো লাগবে? স্বামীর চোখের কেতর (পিচুটি), উকুন, কফ, রক্ত কি ভালবাস? তবে কী ভালবাস? এই যে কইলে (বললে) স্বামী আমার পরম দেবতা। কিন্তু কিছুই যদি ভাল না বাস, তবে তো দেখি, স্বামী বেরিয়ে যায়। স্ত্রী বললো, 'আমার শাখা, সিন্দুর অক্ষয় হোক'। তবে স্বামীর প্রস্রাব খেতে পারবে কি? স্বামীকে খণ্ড খণ্ড করলাম। কাটাকাটি করলাম। বাটিতে বাটিতে তোমার পরম স্বামীকে রাখলাম। স্বামী নিতে পারবে কি? সব বাটি ফেলে দিলে। স্বামীকে ফেলে দিলে। আস্তটাই (সম্পূর্ণটাই) গেল। স্ত্রীর বেলাতেও তাই। তাই দেখা গেল, একটা জিনিসও ভালো নয়। আমরা ঘর করছি। আমার স্বামী, আমার স্ত্রী ইত্যাদি বলছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কার পিছনে দৌড়াচ্ছি? খুঁজতে গেলে একটা জিনিসও ভালো লাগবে না। তবুও আমরা প্রিয়জনের জন্য প্রাণ দিচ্ছি। তাহলে তোমার ভালবাসাটা কিসের জন্য? এদিকে আমার ছেলে, আমার স্ত্রী করছো। কাজেই প্রতিটি জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুঁজতে হবে।

প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ কি? জানতে হবে। প্রকৃতি কি করছে, দেখতে হবে। কোনটা ফেললাম, কোনটা রাখলাম, নিজের মনটা আছে তো? ওকে (মনকে) তাগাদা দিয়ে পাওনাদারের পাওনা মিটাতে হয় সবসময়। মন তাগাদা দেয় পাওনাদারের তাগিদের ন্যায়। **অনেকে আছে পাওনাদারের তাগাদার ভয়ে ছাতি আড়াল করে পালায়। আবার কেহ আছে, পাওনাদারের টাকা মিটিয়ে দেবার জন্য তাগাদা দেয়। আমরাও বৃত্তির দ্বারা মনকে তাগিদ দিচ্ছি। বলছি, হে মন, হে বুদ্ধি, এখনকার পাওনাগুলি মিটিয়ে দাও। তবেই তুমি খালাস। আমরা ঘুম থেকে উঠে প্রত্যেকে প্রত্যেকের চাহিদা মিটাচ্ছি, পাওনা মিটাচ্ছি। টাকা পয়সা শুধু নয়। যার যা পাওনা, স্বামী স্ত্রীর, ছেলের, মায়ের প্রত্যেকের চাহিদা মিটাতে হচ্ছে।** মা ছেলের তাগিদ মিটাচ্ছে। এইভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে মিটানোর

ব্যস্ততায় থেকে আটক হয়ে আছে। প্রত্যেকেই মিটানোর ব্যস্ততায় চলছে। এখন পাওনাদারদের পাওনা মিটালেই আমি যেন খালাস। তাগিদদারদের তাগিদ মিটাবার জন্য এমন ব্যস্ততায় আছি যে নিজেকে মুক্ত করার জন্যই যেন চলছি, যেন মুক্তির স্নান করে নিজেকে খালাস করার চেষ্টা করছি। এইভাবে নিজেকে খালাস বা মুক্ত করার জন্য পাওনাদারদের পাওনা মিটাচ্ছি। নিজেকে খালাস বা মুক্ত করে শান্তিপূর্ণভাবে সংসারে কাটাচ্ছি। ক্ষুধা তাগাদা দিচ্ছে। তৃষ্ণার জল পান করলাম। প্রস্রাব পেল, খালাস করলাম। পায়খানা পেল। পায়খানায় গিয়ে খালাস করলাম কিছু। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় এইভাবে তাগাদা দিচ্ছে এবং ইন্দ্রিয়দ্বারগুলি দিয়ে তাদের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে চলছি এবং মিটাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে পাওনা মিটিয়ে চলছি।

কেহ ঋণশোধ করছে, খরচা করছে। কারও আবার পাওনাদার নেই। দান করছে, যাতে শান্তি আসে। এইভাবে অন্তরের চাহিদা মিটানোর জন্য এতসব হুলুস্থুলু চলছে। তাহলে এমন একটা তৃষ্ণা আছে, যেই তৃষ্ণা নিবারণ হলে মনে শান্তিভাব আসে। মনটা যাতে শান্তিতে থাকে, তারজন্যই এতসব ব্যবস্থা। নিজেকে মুক্ত করার জন্যই যে সব, সেটা সে ভুলে গেছে। নিজেকে মুক্ত করার এই চিন্তায় জীব সবসময় চলছে। **কে না শান্তি চায়। প্রত্যেকেই বলছে, একটু শান্তি চাই। তারজন্য ঠাকুরকে ডাকে। এর মানে হচ্ছে সব মিটিয়ে দিয়ে একটু বসতে চায়। কিন্তু এমনি তাগিদদারের তাগাদা যে, মিটানো আর হয় না। পাওনা আর মেটে না। সুদ এত বেড়েছে যে সুদ দিতে দিতে আসল আর দেওয়া হচ্ছে না। আসল টাকা ঠিকই রয়ে যাচ্ছে।** সুদ দিতে দিতেই চলছে। কাজেই আসল আর মিটছে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমরা সব সময় চাইছি একটা শান্তভাব, মুক্তভাব। সংসারে যা কিছু করছি, চাইছি শান্তিভাব নিয়ে চলতে। আমরা তারই চেষ্টা করছি। শান্তিভাব থাকলেই সৌম্যভাব আসে। সৌম্যভাব অর্থাৎ সুন্দর একটা সুস্পষ্টভাব। শান্তিটা তখন মধুময় হয়। এই মধুময় হওয়ার জন্য মধু এখান থেকেই আহরণ করতে হয়। মৌমাছি ফুলে ফুলে ঘুরে মধু আনে। আমরাও ফুলে ফুলে ঘুরে মধু সংগ্রহ করছি। ছেলে পুলে, নাতি নাতনী, মা বাপ, ভাই, ভগ্নী, বন্ধুবান্ধব, ঠাকুর্দা, ঠাকুমা সবার কাছ থেকেই মৌমাছির ন্যায়



একটু একটু করে মধুপান করছি। মধু নিচ্ছি কেন? ভিতরে মৌচাক সৃষ্টি করার জন্য। অনেক সময় মধু আনতে গিয়ে ঝোলাগুড়ের ভাঁড়ে বসে পড়ে। ঝোলাগুড়ের মিষ্টি, আঠার মত লেগে যায়, আর উঠতে পারে না। কি ফ্যাসাদ। আমাদের শুঁড় দিয়ে মধু আহরণ করতে হবে। মধু আহরণ করতে গিয়ে গুড়ের কলসীতে পড়ে গেলাম নাকি। তাহলে তো আঠার মধ্যে আটকে যাবার ভয় আছে। গুড়ের কলসীতে আটকে পড়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আবার যখন কমলাফুল বা শিউলিফুল হয়, তার মধু পান করে করে আমরা অগ্রসর হতে পারি। উঠে যেতে পারি। আর কেহ যদি ছিঁড়ে নিয়ে যায়, তাহলে দেবতার চরণে থেকে যেতে পারি।

আমরা যখন নিজেকে ভুলে যাই, তখনই গুড়ের কলসীতে বসে পড়লাম। অর্থাৎ সংসারটাকে গুড়ের মত মিষ্টি মনে করে তার মধ্যে আটকে গেলাম। আবার এই সংসারটাকে যদি পদ্মফুলের বাগান বা সরষে ফুলের বাগান ভাবি বা করে নিই, তবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের মধু আহরণ করতে পারি। এই বুঝটুকু যদি ভুলে যাই, তাহলেই মুস্কিল।

**নেশার ঘোরে নেশাখোর সোজা রাস্তাকে বাঁকা দেখে, বাঁকা রাস্তাকে সোজা দেখে। নর্দমাকে রাস্তা ভাবে। আর নিজেকে যে কিভাবে, সেই জানে। এরমধ্যে আবার খালি জায়গায় আছাড়ও খায়। এখন আমাদের যদি বিভ্রান্তির চশমা চোখে এসে পড়ে বা বিভ্রান্তির নেশা এসে পড়ে, তাহলেই মুস্কিল। এই গুড়ের সরবত হতেই পিত্তিনাশ হয়। আবার গুড় থেকেই বার হয় নেশার বস্তু।** এটা বার বার খেলে কিন্তু আর একটা চেহারা হয়ে যায়। কাজেই দেখতে হবে সংসারটাকে আমরা নেশার বস্তু করে ফেললাম নাকি। গুড়ের কলসীতে (সংসারে) আটকে গেলে কিন্তু শেষ হয়ে যাবে। কাজেই ভুল যাতে না করি, সেইজন্যই শুধু হুঁশ। শূন্যে Plane যখন যায়, Map (মানচিত্র) দেখে দেখেই যায়। মানচিত্র সাথে নিয়ে যায়। সাগর পাহাড় পথ যেখানে যা আছে, ঠিকঠাক দেখতে দেখতে যায়।

আমাদেরও মানচিত্র আছে। এই সংসারই আমাদের মানচিত্র। যাকে আমরা বলি, সে আমার নয়। এই বুঝলে মানচিত্রের একটা দিক। যাকে ভালবাসি, সে থাকে না। এই বুঝলে মানচিত্রের আর একটা দিক। যেমন

প্রথমে শিখতে গেলে 'ক' এ কলম, 'খ'-এ খড়ম, 'গ'-এ গণ্ডার, 'ঠ'-এ ঠাকুরদাদা টিকি নাড়ে এইভাবে আওড়ালে তাড়াতাড়ি শেখে। আমাদেরও **মা, বাবা, ভাই, এটা 'ক'-এ কলমের মত পদ বা পথ। এইসব পদ বা পথ ধরে ধরে আমরা অগ্রসর হয়ে যাচ্ছি। আমাদের দিগ্‌দৃষ্টি আছে, দর্শন আছে। ঘ্রাণশক্তি, দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি আছে এবং ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে যথাযথভাবে প্রযোজ্য হচ্ছে।** এইসব বুঝ আছে বলেই তো বুঝতে পারছি। স্থানকাল পাত্র ভেদে আমাদের বৃত্তিগুলি, ভিতরের জিনিসগুলি নিবৃত্তি করতে করতে চলেছে এবং আমরা জানতে পারছি, ভিতরকার যন্ত্রগুলি কি কি ভাবে চালিত হচ্ছে। আমরা ভিতরের যন্ত্র দিয়েই ইন্দ্রিয় নিবৃত্তি করছি। এইভাবে বৃত্তির নিবৃত্তি করার জন্যই তুমি অগ্রসর হচ্ছো। নানাভাবে নানাপথে যাদের টানছো, নিচ্ছো, আনছো, ছাড়ছো, তোমাকে বাদ দিয়ে যাদের আপন করতে চাইছো, তোমার আপনতাকে বিকাশ করছো, প্রকাশ করছো, তাতে তোমাকেই তুমি আপন করতে চাইছো, আরও বেশী গভীরভাবে তোমাকেই তুমি অন্তর দিয়ে ভালবাসছো। তুমি তোমার অন্তরকে ভালবাসতে পারছো বলেই তুমি তোমার জীবনকে দিয়ে দিলে। যাকে দিচ্ছ, সে উপলক্ষ্যমাত্র। তার কাছে তোমাকে তুমি প্রকাশ করছো। এই সংসারটা হচ্ছে কেন্দ্রস্থান। এই কেন্দ্রমূলকে কেন্দ্র করে তুমি তোমার আকৃতিতে বিকৃতিতে মাকে কেন্দ্র করে, স্ত্রীকে কেন্দ্র করে নিজেকেই প্রকাশ করছো, ব্যক্ত করছো। তোমার অব্যক্ত জিনিস, তোমার ভিতরে যাহা অব্যক্ত ছিল, তোমার ভিতরকার সেই অব্যক্ত বস্তুকে ব্যক্ত করার জন্যই, তোমাকে প্রকাশ্যে জ্ঞাত করার জন্যই তুমি ব্যক্ত করছো। যাতে ভুল করতে না হয়, সেটা দেখা কি ভুল? তোমার জন্যই যে তুমি করছো, ইহা জানবে, ইহা বুঝবে। এইটুকু যে বুঝ, ইহা নিয়ে চলবে। এইটুকুই যে পাকা বুঝ, এই বুঝ নিয়ে বুঝে বুঝে চলতে যাতে পার, তাহাই দেখবে। সংসারে এটাই অহর্নিশ চলছে। তোমাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এই জীবজগৎ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ।

**এত সৃষ্টি কেন হল? তোমার ভিতরে অগণিত বস্তু, ঝর্ণার মত, ফোয়ারার মত চলেছে। এই অগণিত সৃষ্টির মধ্যে তুমি যে তোমাকে ব্যবহার করতে পারো বা প্রকাশ করতে পারো, তারজন্যই হারমনির ন্যায়**



**সব কিছু সুসজ্জিত রয়েছে, তোমার ভিতরে সুর রয়েছে। এই সুরটা দিয়ে যখন বিশ্বের হারমনিতে সুর ফেলে সুর দেবে, তখন বুঝবে তোমাকেই বুঝাবার জন্য, তোমার ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিত্বকেই প্রকাশ করার জন্য সৃষ্টি।** কেন এত সৃষ্টি? তোমাকে জানাবার জন্য, তোমাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, তোমার ভিতরে যে অজস্র ধারা চলেছে, অজস্রভাবে তাকে বুঝাবার জন্যই এই সৃষ্টি। আবহমান হতে এই যে অগণিত সৃষ্টির ধারা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে, সেই অগণিত সৃষ্টির মাঝে তুমিই যে আছ, তোমারই সত্তা বিরাজমান অবস্থায় বিরাজিত হয়ে রয়েছে, তখনই বুঝবে। **স্রষ্টার এই সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারায় অগণিত বস্তুর বস্তুত্বের মাঝে বিশ্ব বিরাটের সুর যখন সাধতে থাকবে, আপনি সে সুরে সাধা হয়ে যাবে। সুর যখন আপনি খেলতে থাকবে, তখন বুঝবে, তোমার সুর তোমাতেই যে প্রতিষ্ঠিত।** তখন দেখবে অগণিত মাতা, অগণিত স্বামী, অগণিত স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, অগণিত জীবজন্তু অগণিত রূপে রূপে রূপান্তরিত হয়ে সব সুরে সুরে সুরময় হয়ে তুমি আজ আবার এসেছো। তোমার দিগ্‌দৃষ্টি খুলে যাবে। **তোমার অন্তঃস্তলে তুমি দেখতে পাবে, তুমি সর্বত্র, তুমি অখণ্ড বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত। তোমাতেই সব ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, লয় হয়ে যাচ্ছে। তোমারই একভাব থেকে বহুভাব।** আজ এই যে অগণিতভাব তোমা হতেই হয়েছে। আবার বহুভাব বোধগম্য হয়ে, তোমার ভিতর প্রতিষ্ঠিত হয়ে, তোমার ভিতরেই এই বাস্তবতার বাজনা বাজছে। তোমার হুঙ্কারের ধ্বনিতে বা ঝঙ্কার ধ্বনিতে তখন সব জানতে পারবে একমুহূর্ত্তে।

তখন দেখবে, এই যে অগণিত জীব, অগণিত সৃষ্টি, স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন, সেই শক্তি, সেই সুর তোমার ভিতরে রয়েছে। তখন তুমি স্বয়ং স্রষ্টার সব ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেলে। তোমাকে তুমি অনন্ত শক্তিমান রূপে চিনতে পারলে, তুমি স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে নিলে। তুমি তখন বিশ্বের স্বয়ং মালিক হয়ে দাঁড়াবে। এই শ্রেষ্ঠত্ব দান করবার জন্য, স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ স্থান যাতে জীবকুল অধিকার করতে পারে, তারজন্য স্রষ্টা যে আপনমনে আকুলি বিকলি করে চিৎকার করছেন, সৃষ্ট বস্তু সমূহের মাধ্যমে শুধু বলছেন, তুমি আমাকে দেখো, বোঝ, জান। এই যে অগণিত রূপ সৃষ্টি করেছি, সব তোমার ভিতর প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি তা দেখো,

গভীরভাবে বোঝ। তোমাকে একটা আসন দেওয়ার জন্য আমার প্রাণের সাড়া রয়েছে তোমার ভিতর। তুমি (জীব) আমাতে (স্রষ্টার সহিত) জড়িত। তোমার ভিতরেই যে সব শক্তি বিদ্যমান। এত অগণিত সাড়ার সাড়া পেয়েও কেন বিভ্রান্ত হচ্ছ? **এই সৃষ্টির মাঝে অহর্নিশ যে সুর চলছে, যে অনন্ত গতির ধারা বইছে, এটা তোমাদেরই সুর। সৃষ্টির যে সুর, যে তত্ত্ব বলা হয়, সেই স্তর রয়েছে তোমাদের অন্তরে।** এই জল নদীরই জল, সমুদ্রেরই জল; সব একই জল।

এতবড় সমুদ্র ইচ্ছা করলেই সব লবণাক্ত করে দিতে পারে। নদী ক্ষুদ্র হলেও লবণহীন, কিন্তু জল একই। গঙ্গা ও সমুদ্রের মিলনস্থানই হ'ল মিলনকেন্দ্র। সেইরূপ এই সংসারও সেই মিলনস্থান, মিলনকেন্দ্র, সকলের মিলিত সুরের কেন্দ্র। এখানেই বারবার সঙ্গম করা হয় বা আলোড়ন করা হয়। এই সংসারই তত্ত্ব। ইহাই সবসময় অনন্ত বিশ্বের, অনন্ত সৃষ্টির তত্ত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছে। এই সংসার হতেই তত্ত্ব নিয়ে এক একজন তত্ত্বজ্ঞ হয়ে গেল, সব তত্ত্বময় করে ফেললো। তত্ত্ব যে সদা উদ্ভাসিত, জ্ঞানের আলোকে সর্বদা আলোকিত। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন গ্রন্থের ন্যায় এই সংসার তত্ত্ব পাত্র পাত্রী ভেদে তোমাদের ভিতর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যার যার মাত্রানুযায়ী অন্তরের অন্তঃস্থলে বিকশিত হবে, সেই তত্ত্বকে জাগিয়ে তুলবে। আজ এই থাক।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*



# ভাগ্য বা কর্মফল, এগুলো নিজেদের এক প্রকার সান্ত্বনামূলক বাণী

**৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩**
**রাজা বসন্তরায় রোড, কলকাতা**

এই পরিদৃশ্যমান জগতে প্রতিটি জীবের জীবনই এক একখানি গ্রন্থ। তাই জীবনযাত্রার সাথে সাথে সকলেই যেন প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠ করে চলেছে। প্রকৃতির স্কুলে আছে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী। প্রতিটি জীবই এক একটি শ্রেণীতে আবদ্ধ আছে বলেই বিশ্ববিরাট ছাড়া কেউ নয়। দর্শন, স্পর্শন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই বিরাটকে চেনা বা জানা যায়। বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন অবস্থায় বিরাটের যে প্রকাশ, এগুলো গুণবিশিষ্ট কেবল। বিশ্ববিরাটের প্রয়োজনে আপনভাবে সবাইকে নিয়েই সে আছে। গুণের যে বিকাশ, তাহা আছে ভালমন্দ আছে বলেই। অবতার, সাধক, বদমায়েস—এদের মধ্যে কেউ ধারাপাতার ধারায়, কেউ আদর্শলিপির আদর্শে, আবার কেউ বা বর্ণমালার বর্ণে বর্ণে জড়িয়ে রয়েছে। একই স্কুলের লম্বা ঘরে সবাই শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আছে। **ভাগ্য বা কপাল, এগুলো নিজেদের এক প্রকার সান্ত্বনামূলক বাণী। বস্তুতঃ কেহ এর উপর নির্ভর করে চলে না। কেবল আওড়িয়ে যায়।** অন্তর্যামিত্বহীন দেশে বাইরের আচরণ দেখে সবার বিচার। যেকোন কার্যে সফল ও অসফল, সেইভাবেই নাম নেয়। 'হলো না', 'হবে না', কথাগুলো ঠিক নয়। শুধু অজানার পিছে ধেয়ে যাওয়া, জানার জন্য। বুঝটিতে ছিল অবুঝ, পড়ায় ছিল কার্পণ্য; তারজন্যই ফেল (fail). যার success হলো, তার বুঝ ছিল খাঁটি। একদিকে success না হলেও অন্যদিকে প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়। শক্তির বিকাশ হয়েই যাচ্ছে যার যার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়।

বড়লোকের বাড়ীতে সরিষার বীজ বপন করা চলে না। গভর্ণরের বাড়ীতে সরিষার বীজের বরাত ভাল বলা যায় না। নিজেদের কাজ করার ত্রুটির জন্য বলে ভাগ্যমন্দ। গোবর আছে; কিন্তু আমরা গাছে সার দেই না, পরিচর্যা করি না। গাছ ভাল হবে কি করে? 'কেন'র উপর 'কেন'?

'কেন'তেই থাকে। কোন সমাধান কেহ করতে পারে না বা করা যায় না। **রোগীর মাথায় জল হয়েছে। ঐ জল আর কিছুক্ষণ থাকলেই রোগী শেষ হয়ে যেত। এটা ভাগ্য নয়। বুঝের অভাব ছিল ডাক্তারদের।** মাথার জল বের করে দেওয়া হলো। রোগী ভাল হয়ে গেল। ডাক্তাররা visit নিতে পারলো না। গুরুদেব ভাল করে দিলেন। তিনি কিছু নেন না বলে, কেহই নিতে পারলো না। তিনি (গুরুদেব) বললেন, আমি যখন নেব না, কোন ডাক্তারও visit নিতে পারবে না। তিন দিনের কাজ, গান গাইছে তিন বৎসর ধরে। কপাল মন্দ ব'লে অনেকেই মাঝপথে কাজ ছেড়ে দেয়। একভাবে কাজ করে যায় Principle ঠিক রেখে, এরূপ ব্যক্তি দেখি না। গড়তে গেলে ধাক্কা খেতে হয়, ঝড় সইতে হয়। প্রতি অবস্থার জন্য আমি প্রস্তুত।

যখন আমরা মিশে ছিলাম, খোঁজের মাঝে নিখোঁজ হয়েই ছিলাম। রক্ত হতে বীর্য। আবার মাটি, জল, আলো, বাতাস হতে খাদ্য। কাজেই জল, আলো, বাতাস, মাটি, খাদ্য, রক্ত, বীর্য—তা হতেই আমরা। **খাদ্য হতে শিশু, শিশু হতে বৃদ্ধ, বৃদ্ধ হতে মৃত্যু। দেহ যখন জলে, বাতাসে, পঞ্চভূতে মিশে যায়, সেটা মৃত্যু নয়, পরিবর্ত্তন। আমরা রূপে রূপে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছি।**

এই নাম, এই মূলমন্ত্রই সেই প্রণব মন্ত্র। সাধারণতঃ সেই ধ্বনি হতেই সৃষ্টি। বাচ্চা শিশু যখন কাঁদে ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া; মা যখন বাচ্চা প্রসব করেন, উঃ উঃ উঃ। এর ভিতর যে হুঙ্কার ধ্বনি আছে, মৃত্যুর ভিতরও সেই হুঙ্কার ধ্বনি। 'উঃ' সেই মহা নিনাদের টান। শোকে, দুঃখে, রোগে আমরা কাঁদি, আবার হাসির জন্য অন্য শব্দ আশ্রয় করি। মূল শব্দ, মূল ধ্বনিতে সমস্ত আদি ধ্বনি পাওয়া যায়। হাট বাজারের কেনা বেচার সুর, দূর থেকে শোনা যায় গুম্ গুম্ ধ্বনি। সেই ধ্বনি হচ্ছে মূলনাদ। **এই অনন্ত পৃথিবী গণনা করা সম্ভব নয়। প্রতিটি পৃথিবীর মাঝেই আছে সেই মূলধ্বনি, মূলনাদ। সেই নামই যখন মহানামে সুর দিয়ে ওঠে, সেখানে পরমানন্দ পরম শান্তি বিরাজ করে।** তাই আছে শুধু এক ধ্বনি, এক সাড়া, এক প্রেম, এক জ্ঞান। আজ আমাদের ধর্মবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। নানারকমভাবে আঘাত প্রতিঘাত আক্রমণ করতে চেষ্টা করছে।

মহাপ্রভু যেভাবে নাম বিলিয়ে গেছেন, আমিও সেভাবেই তোমাদের এই মহামন্ত্র দিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের ভিতরে জেগে উঠুক সেই প্রকৃতির সুরের



সাড়া। এই বিরাট যজ্ঞ, মহাযজ্ঞ; নামরূপ আলাদা যজ্ঞ। এই নাম নিয়ে তোমরা সেই মহাযজ্ঞের দিকে এগিয়ে যাও। জেগে উঠুক তোমাদের ভিতরে সেই মহানিনাদের সুর। মহাপ্রভুর মামা ছিলেন বিষ্ণুদাস ঠাকুর। আমার মামার বাড়ীর বংশ (মাতুল বংশ) আর বিষ্ণুদাস ঠাকুরের বংশ এক বংশ।

কোন গাছ গোড়া থেকে কেটে দিলেও বাড়তে থাকে, যতক্ষণ রস থাকে। এই ঝগড়া বিবাদ এগুলো যতক্ষণ রাগ আছে; তারপর একেবারে তেজপাতা। রান্নার স্বাদ হয় না। হবে কি করে? মন সমস্তটুকুই প্রায় বাইরের পরিপাটির জন্য। রান্নার উপকরণ সবই আছে, কিন্তু স্বাদ নেই। ঠাকুর ২ পদ রান্না করে দিলেন। বাড়ীর সমস্ত লোক ২০ পদ রান্নার মধ্যে ঐ ২ পদ ৩ বার করে চেয়ে খেল। কেন হলো স্বাদ? শুধু বুঝের জন্য। আর ওদের বেলায়? নিরস্ত্রের এক অস্ত্র পিঁয়াজ। তাই, কি করে স্বাদ হবে?

কুস্তিতে চার ব্যক্তির সঙ্গে লড়াই করে সবাই একেবারে নাস্তানাবুদ। ঠাকুর একাদিক্রমে ১৯ বৎসর Exercise করছেন। এভাবে নিয়মানুযায়ী কে করে? নিমডাল আনার অভাবে অঙ্গার দিয়ে দাঁত মাজে। বেশীরভাগই তাই করে। এরাই ভাগ্যের উপর বাসা বাঁধে। ভিতরে বুঝের যতক্ষণ না বিকাশ হবে, ততক্ষণ প্রকৃতির Book (গ্রন্থ) থেকে সব শিখে নিতে হবে। **অনেকে কপাল, ভাগ্যকে সবার পিছনে নাড়াচাড়া করে। সেই বুঝই কি ঠিক আছে কারো? কাজেই কপাল ভাগ্যের কথা ব'লে শুধু কথার কথাই বলা হয়, এগুলো শুধু সান্ত্বনামূলক বাক্য।** ঠিকভাবে কাজ করে যদি কেহ যেতে পারে, তার সফলতা অনিবার্য। মানচিত্র দেখেই বিভিন্ন distance-এ যায় এরোপ্লেন। আবার স্থলপথেও দেখে গেলে নানা আঁকাবাঁকা সত্ত্বেও যাত্রার বিঘ্ন ঘটে না। দিগ্‌ভ্রান্ত না যদি হই, তবে সাগর আমার সম্মুখীন হতে বাধ্য এবং উদ্দেশ্য সফল হবেই। উদ্দেশ্য এবং পথ ঠিক হলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। ভাগ্য টোকাতে (কুড়াতে) গিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। তখন বলে, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'।

ভাল মন্দ বুঝি না। যাওয়ার (চলার) পথে চলেছি। থামতে নেই কোথাও। শিষ্য চা খেতে বসেছে, Train fail. গুরু বলেন, 'তুই আমাকে চা' (কামনা কর)। 'চা'-ই (পানীয়) তখন তার চাওয়া পাওয়া হয়ে গেল। **প্রকৃতির গতি কাহারও হাঁচি কাশিতে চলে না। সূর্য, চন্দ্র, ঝড়, বিদ্যুৎ,**

**ষড়ঋতু, বর্ষা, ঠাণ্ডা, গরম ইত্যাদি প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি অবস্থাই প্রকৃতির অনন্ত গতির ধারায় চলেছে।** ভাগ্য, মন্দ, খারাপ, ভাল ইত্যাদি কথাগুলিতে বেশীর ভাগই 'তারা' বুঝতে 'মারা' বুঝে। সপ্ত কথার ন্যায় সবাই বলে, ভাল, মন্দ, ভাগ্য ইত্যাদি।

সৃষ্টি চলেছে শুধু কর্মের উপর। যে যতবেশী কর্ম করবে, সে ততবেশী এগিয়ে যাবে। এক নিয়মে সব চলবে। অনিমা, লঘিমা এগুলি শুধু এগিয়ে যাওয়ার সাড়া। গতি খুব বেশী হলে এগুলির প্রকাশ নাও হতে পারে। Lift-এ ৭/৮ তলায় যেতে মাঝের তলা দেখা না গেলেও ক্ষতি নেই। **ক্ষেত্র বুঝে কৃষক বীজদান করেন। গুরু বুঝে বুঝে মন্ত্র দেন সবাইকে। তাঁর দায়িত্ব বিরাট। গুরুর বীজমন্ত্র Time Bomb-এর ন্যায়। সময়মত ফাটবেই। এর আগে যত কান্নাকাটি কর না কেন, কিছুই হবে না।**

তারের যন্ত্রে ডোমরা পিঠ দিয়ে ঘষছে আর সুন্দর সুর বের হচ্ছে। সঙ্গীত সাধক অবশেষে ঠোঁট দিয়ে বাজাতে চেষ্টা করলো; বাঁশী যেভাবে সৃষ্টিতে এল। এই সুরটুকুনু প্রথমে ধরিয়ে দেন গুরু। শিষ্যের পূর্ণভার গ্রহণ করেন বলেই তো তিনি গুরু। **বীজ যদি মুক্তির গান না গায় অর্থাৎ unsuccessful শিষ্যের জন্য আবার দেহ ধারণ করতে হয় গুরুর। কাজেই তিনি দায়িত্ব বুঝেই গুছিয়ে দেন। এখন সব খোসার বীজ ছড়াচ্ছে। তাই গাছও হয় না। ক্ষমতাবান জন্মসিদ্ধ মহানরাই এইরূপ দায়িত্ব নিয়ে আসেন।** ব্রহ্মের সুর বা বিরাটের সুরই তাঁরা দেন। যন্ত্রের সঙ্গে ছন্দ যদি গাঁথা থাকে, তবে সবকিছু ফাঁকি আপনিই ধরা পড়বে। মৃত্যুর ভয়কে উপেক্ষা করে সুর সাগরের সুরে সুর দেওয়ার জন্য রাজা ওস্তাদকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিলেন। অন্যরা মৃত্যুভয়ে চুপ করে রইল।

তোমরা এখন যন্ত্রণার সুরে সুর দিচ্ছ। বিরাটের সুরে সুর না দিয়ে ক্ষণিকের মোহে হাবুডুবু খাচ্ছ। তোমাদের ভিতরের সপ্তচক্রে মহামন্ত্র ও মহানামের সুর দাও। ওদের জাগরিত কর। সেই কথাই বারবার বলি, শ্রেণীবদ্ধ অবস্থায় যখন আছ, সফলতা অনিবার্য। আজ এই থাক।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*



# এমন সুন্দর সৃষ্টি, যিনি স্রষ্টা, তিনি কেমন?

**পাম এ্যাভিনিউ কোলকাতা**
**৩০শে অক্টোবর, ১৯৬৬**

আচ্ছা, কি বিষয় নিয়ে বলি বলতো? পূজা তো শেষ হলো। পূজার বিষয় নিয়েই কিছু বলবো। শাস্ত্রে যে পূজার কথা বলা হয়েছে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ক্রমশঃ ক্রমশঃ অনেকটা বিকৃত হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে বিকৃত হতে হতে, তবুও যা আছে, তা অনেকটা আছে। পূজার প্রকৃত অর্থ ছিল অন্যরকম। এই ব্যাবহারিক জগতে মানুষ যাতে গড়ে ওঠে, সমাজে যাতে সুন্দর সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, তারজন্য বিচক্ষণরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এর আগে কেহ কিছু জানতো না। তারা বুঝতো না কিভাবে চলা উচিত। যখন বুঝলো, তখন ভাবলো, কি করা যায়।

**সৃষ্টির নিয়মে যে শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে, সেই শৃঙ্খলাতেই ধ্যান করার বুদ্ধি, পূজা করার বুদ্ধি, মূর্তি গড়ার বুদ্ধি এসেছে। পূজাটা মনগড়া নয়। ভূগর্ভে যে নিয়মে সৃষ্টি হয়েছে, যে ধারাতে সৃষ্টি হয়েছে, সেই ধারাতেই আমাদের সৃষ্টিবুদ্ধি জেগেছে।** আজ থেকে লক্ষ বছর আগে মনের মধ্যে যে গড়ার বুদ্ধি ছিল, কিভাবে গড়ালে, কোন্ পথে অবস্থান করলে দুর্লভ জিনিস পাওয়া যায়, সেইভাবেই বুদ্ধি গজিয়েছে। আজকের যে জগৎ হাজার হাজার বছর আগে আরও অনেক উন্নত ছিল। আবার সেগুলো আসছে। অনেক আগে যেগুলো ছিল, তারও আগে যেগুলো ছিল, সেগুলোই ফিরে ফিরে আসছে। বুদ্ধিও সেইভাবেই এসেছে।

এই যে সৃষ্টি, সৃষ্টির যে সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতা, তার যে নিয়মানুবর্তিতা কিভাবে আসছে, জানা নেই। এর উদ্দেশ্য কি? কোথায় যেতে হবে, জানতে পারছো না। **এমন সুন্দর সৃষ্টি, যিনি স্রষ্টা, তিনি কেমন? তাঁর রূপ কি? তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক কি? যদিও আমরা সম্পর্কেই আছি, তবুও সেই সম্পর্ক খুঁজতে যাই। কোন্ পথ অবলম্বন করলে কি করা যায়, ভাবতে থাকি। কেন এলাম? কোথায় এলাম? কি বা উদ্দেশ্যে সৃষ্টির এত বৈচিত্র্য,**

**জানার আগ্রহে জানতে চাই। সহজে যদি কোন সমাধানে পৌঁছানো যায়, সেই সেই ভাবে বুদ্ধি সাজাতে থাকে। গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে তাদের কানে নানা ধ্বনি এসে বাজতো। শুয়ে আছে হঠাৎ পাহাড় থেকে একটা শব্দ হল, 'এই পাহাড়ে এসে পূজা কর।'** সবাই পাহাড়ে এসে ভিড় করতে আরম্ভ করলো। সবাই পাথরে কোলাকুলি করছে, গড়াগড়ি করছে, হৈহল্লা করছে, কাঁদছে। কিভাবে পূজা করবে, জানে না। সবাই দাঁড়িয়ে আছে। কিভাবে কি করবে, জানে না। এমনভাবে কান্নাকাটি করছে, যেন কিছু একটার হদিশ পেতে চাইছে। হঠাৎ একটা আওয়াজ হলো, 'এই একটা ছোট পাথর নিয়ে এটাকে পূজা কর।' তারপর বললো, 'তোরা নিজেরা যে চেহারায় আছিস, সেইভাবে মূর্ত্তি গড়ে পূজা কর।' এটা এমনই জিনিস, যতই সাধনা করে, যতই তন্ময় হয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকে, ততই একটার পর একটা নির্দেশ তারা পেতে থাকলো। আজকে আমরা সেই তন্ময়তা থেকে দূরে সরে এসেছি। এখন সব নির্দেশ ঠিকমত পাচ্ছি না। তবে যন্ত্রের মাধ্যমে দূর থেকে অনেক শব্দ নিয়ে আসছে। মন্ত্রের সাথে সাথে যন্ত্রও তৈরী হয়ে গেছে। নদীর সামনে যত সহজে অল্প পরিশ্রমে জল পাওয়া যায়, দূরে গেলে একটু অসুবিধা হবেই। কাজেই আমরা সাধনা হতে দূরে এসে পড়েছি বলে নির্দেশ পেতে অসুবিধা হচ্ছে। **তখন মূর্ত্তিগুলো যে গড়তো, মূর্ত্তি কথা বলতো। মূর্তিগুলো বলতো, 'আরও রং দে। আরও সুন্দর করে সাজিয়ে দে। তার হাতটা ঠিকমতো করিস নাই।' এইভাবে বলে বলে দিত।** ওরা অবাক হয়ে যেত, মূর্ত্তিগুলো ভেঙে দেখতো, কিভাবে কথা বলে। তখন অতি সহজে ধ্বনিটা ধরতে পারতো। স্রষ্টার নিয়মের যে গতি, তার যে ধ্বনি, সেই ধ্বনির যে প্রতিধ্বনি হয়, তা হতে অতি সহজেই উত্তরটা দিতে পারতো। তখন অল্পচিন্তা করলেই সাড়া পাওয়া যেত।

আজও চিত্রকূট পাহাড়ে ডাকলে বাঁশটা আপনাআপনি নত হয়ে যায়। কোথা হতে একটা শকুন ধেয়ে এসে ডাকতে তাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বাঁশটি বাঁকা হয়ে নত না হয়ে যায়, ততক্ষণ শকুন ডেকে যায়। তাদের মধ্যে পাহাড়িয়া ভাবটা এখনও আছে বলে হয়ে যায়। আমাদের মধ্যে সেটা সজাগ হতে পারছে না। আমরা সজাগ হতে পারছি না দূরে সরে আছি বলে। তখন মূর্ত্তি ঘরের মধ্যে কথা বলছে, ঘাড় নাড়ছে। এটা কি করে সম্ভব হতে পারে?



মাটির মূর্ত্তি বলে বলে দিচ্ছে, 'এটা জোড়া লাগা। ওটা কর।' তখন একজন চিন্তা করতে লাগলো, কিভাবে হয়। সবগুলি মন একটার সাথে বাড়ি খেতে থাকে। **আমাদের দেশে সেইরকম সাপের ওঝা আছে, যে কড়িগুলো মন্ত্র পড়ে ছেড়ে দিলে কড়িগুলো দৌড়িয়ে গিয়ে সাপটাকে ধরে নিয়ে আসতে পারে। এখনও এরূপ চলেছে, তখনও ছিল।** আগে বলেছিলাম, চুল পড়েছিল। মন্ত্রের জোরে চুল বেয়ে সাপ উঠলো। এমন যে শক্তি, এমন যে প্রাণের স্পর্শ, কোন কোন বিষয়বস্তুতে কোন কোন শব্দে তার সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু এখন বেশীরভাগই এলোমেলো হয়ে গেছে। তা বলে মন্ত্রতো এলোমেলো হয়নি। এই যে মূর্ত্তিগুলো নড়াচড়া করছে, কথা বলছে, একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি করে সম্ভব হয়?'

**তখন একজন বললো, 'দেখ, আমরা সবাই মিলে যেকোন বস্তুকে চিন্তা করলে সেই বস্তু ভেসে ওঠে।' যেমন একটা রেকর্ডে গান আটকা থাকে, পিনের খোঁচাতে গান বাজতে শুরু করে। কাজেই একটা গান যদি ওর (রেকর্ডের) মধ্যে আটকা তাকে, তবে সজাগ জিনিস একটা, তার পক্ষে আটক থাকা কোন কিছু নয়। গাছ কথা বলছে; এমন সময় (যুগ) ছিল, যখন গাছ কথা বলতো। ইংরাজী বল, পাহাড়ী ভাষা বল, ঐ ভাষায় সে (গাছ) উত্তর দিবে।** এই যে কথা বলছি, টেপ রেকর্ডে নিয়ে নিচ্ছে। এই কথা উঠে যাচ্ছে। কাজেই একটা ফিতাতে যদি আমার কথা উঠে যেতে পারে, তবে সজাগ, তার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশী সজাগ বস্তুকেও গ্রহণ করতে পারে। একটা গাছ কথা বলবে, এ আর এমন কি। এখনও এমন হয়। তবে মনের দিকটা অন্যদিকে এত বেশী চলে গেছে যে, তাই হয় না। যে মনের মননে প্রতিবস্তু সজাগ হবে, সেখানে এক ফোঁটার মত মাত্র ঐ কার্যে ব্যবহার হয়। ১৫ আনাই অন্যদিকে চলে যাওয়ায়, সব কিছু না হওয়ার দিকেই ধাবিত হচ্ছে। আমাদের না হওয়ার অবস্থায়, না হওয়ার দিকে মনের ১৫ আনা চলে গেছে।

এই যে কুমাররা মূর্ত্তি গড়ায়, এই যে মূর্ত্তি গড়ার বিদ্যা, কিভাবে আয়ত্ত করলো? কয়েকটা মূর্ত্তি দেখলাম, অদ্ভুত সুন্দর; তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। এই ভাবটা কোন্ ভাব হতে এসেছে? দেবভাব, দেবতার কথা ভাবতে ভাবতে সেই ভাব মূর্ত্তির মধ্যে রেখেছে। কাজেই এই ভাবটা, এই ঘরোয়ানাটা

মূর্ত্তি গড়ার মধ্যে সজাগ রয়েছে। একটা মূর্ত্তি, হাজার হাজার বছর ধরে সেখানে সবাই পূজা করতো। গ্রামে এক জায়গায় পূজা করতে বললো। আমি গিয়েছি। আমাকে বলছে, 'ফুল দিন।' আমি ফুল নিয়ে ওর (মূর্ত্তির) মাথায় দিয়েছি। মূর্ত্তির মধ্যে সবাই দেখে চোখ মুখ নড়াচড়া করছে। ঐ মূর্ত্তির মধ্যে এমন একটা সুর রয়েছে, তাতেই এমনটি হচ্ছে। যে কোন বিষয়বস্তুর সাথে মন যদি এক হয়ে যায়, তবে ঐরকম হয়ে যায়। দেখে আমার ভালই লাগছে। **পূজার সময়ে আমি যেতাম। দুর্গামণ্ডপে কাজ করতাম। ভাল লাগতো। মনে হতো, প্রাণ আছে। প্রাণ ঠিকই আছে। কিন্তু যারা পূজা করছে, তারা বুঝে না। তারা সেইভাবে প্রায়ই থাকে না। তারা দেখে, শাড়ী কাপড়গুলি ঠিক আছে কি না।** দেবদেবীর মূর্ত্তি ছেড়ে অসুর আর সিংহের তলায় (নীচে) নজর গেছে বেশী। কারণ ওখানেই তো কাপড়গুলি রাখে।

ঐ যে কথায় আছে না, গণশার মা (দুর্গা) ঝি-গিরি করে। দেশ থেকে ভাই এসেছে দিদির বাড়ীতে। সে বলে, 'দিদি, ও কে?' দিদি বলে, 'ও গণশার মা'। গণশার মা'র কাজকর্ম দেখে ভাই তো অবাক। বলে, একে তো সাধারণ মানুষ মনে হয় না। সার্থক সাধিকা মনে হচ্ছে। ভাইয়ের সন্দেহ বেড়েই চলেছে। সে গণশার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইলো। কিন্তু দেখা আর পেল না। অবশেষে তার যাওয়ার সময় হয়ে এলো। ভাইয়ের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয়। সে একখানি লালপাড় শাড়ী দিদির হাতে দিয়ে বললো, 'শাড়ীখানা গণশার মাকে দিও। আর বলো, শাড়ীখানা পরে সে যেন দুর্গাপূজার সময় আমাদের বাড়ী যায়।' দিদির কাছে সব শুনে গণশার মা বললো, 'ঠিক আছে। অষ্টমী পূজার দিন আপনার ভাইয়ের বাড়ী যাব।' দিদি ভাইকে জানিয়ে দিল। ভাই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। ষষ্ঠী, সপ্তমী পার হয়ে গেল। অবশেষে অষ্টমী পূজার দিন সবাই দেখতে পেল, মা দুর্গার মূর্ত্তি নিজে শাড়ীখানা পরে দাঁড়িয়ে আছে। ভাই 'মা, মা' বলে কান্নায় লুটিয়ে পড়লো। শুনতে গল্পের মতো লাগলেও এরূপ ঘটনা নানাভাবে নানাদিকে এখনও হয়ে যাচ্ছে। আজও মানুষ মূর্ত্তি নিয়ে যায়। প্রত্যেকটি মূর্ত্তি অনেক জায়গায় প্রত্যেককে সুযোগ দেবার জন্য জাগে। **একটা কথা মনে রেখো, যে কোন জিনিসে পরপর হাজার হাজার বছর যদি একই জিনিস যোগ করতে থাকে, তার ভিতর প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়।** পূজা সেইভাবেই করে আসছে। এটা



একভাবে গড়ে ওঠার অপূর্ব উপায়। একটা জিনিস সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু সাধনাটাও যদি সেইভাবে জানতো, সেটাও গড়ে উঠতো। **বেশীরভাগ মনঃসংযোগ অন্যদিকে চলে যাওয়াতে সত্যিকারের মূর্ত্তিপূজার সাধনা বিকৃত হয়ে গেছে। ধর্মটা অন্যদিকে চলে গেছে। যেকোন ব্যক্তি যদি প্রকৃতভাবে মূর্ত্তিচিন্তায় সাধনা করে, মূর্ত্তির নিকট পূজা করে, তবে সেটা সহজে পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে চিন্তায়ই নেই। তা সম্ভব হয় না বলেই বলা হয়, 'জপ কর।'**

এক একটা মেঘ নিজস্ব একটা রূপ নিয়ে বসে আছে। মেঘের রূপ হতে এক একটা মূর্ত্তি গড়া সহজ হল। মেঘের মধ্যে প্রাণ আছে, সাড়া আছে। প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখার সাহায্যকারী এই মেঘ সহযোগিতা করে চিন্তার। সে নিজে রং বে-রং হয় সূর্যের দ্বারা। সূর্য মেঘের উপর পড়লে সুন্দর সুন্দর রং হয়। সেটাই যেন তার নিজস্ব রং। এক মেটে, দো মেটে হয় না? ঐ রংগুলো আমাদের মধ্যে চিন্তায় ভাবনায় বাড়ি খেতে থাকে। সেগুলি চিন্তা করতে করতে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। নীলাকাশ মূর্ত্তি গড়ার সাহায্য করছে। একদিকে সূর্য আলোকদান করছে। চন্দ্র আছে, নক্ষত্রপুঞ্জ আছে। রং-এ গেলে রং আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সবই এক রং কি না। কালো থাক, সাদা থাক, সমস্ত মূর্ত্তির শেষে এক রং-এ নিয়ে যায়। সমস্ত মূর্ত্তির চিন্তাধারাটা এক রং-এ ফেলে দেয়। আকাশ রং করে দেয়। কাজেই মানচিত্রের ন্যায় আমাদের একটা অবলম্বন থাকা দরকার, যাকে অবলম্বন করে আমরা এগিয়ে যাব। জগতের রূপটাও একটা মূর্ত্তি। পৃথিবী, পাহাড়, পর্বত এক একটা মূর্ত্তি। **এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছু, যা কিছু দেখছো, সবই একটা রূপের ভিতর দিয়ে। সব তাঁরই একটা রূপ, এক একটা ক্ষুদ্র মূর্ত্তির রূপ। এই রূপটা চিন্তা করতে করতে আর মাটির মূর্ত্তির রূপে থাকে না। থাকতো যদি দেহ থাকতো। মাটির মূর্ত্তির দেহের গতির সাথে সাথে ঐ মূর্ত্তির রূপ নিত। ক্রমশঃ ক্রমশঃ শেষবেলায় ঐ রূপটাও আস্তে আস্তে তোমার নিজের রূপের সঙ্গে মিশতে চায়।** শেষবেলায় দেখবে, তোমারই রূপে মিশে যাচ্ছে। দর্পণে যেমন নিজের রূপ দেখে, তুমি নিজেই যেন দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে আছ। মূর্ত্তি দেখতে দেখতে নিজের রূপ দেখছো।

**মূর্ত্তিপূজার নিয়ম হলো, স্রষ্টার নিয়ম হলো, যতগুলি রূপ আছে,**

**যত সাধনা আছে, শেষবেলায় তোমার রূপে সব রূপ ভেসে উঠবে। যখন দেখবে, তোমারই রূপটা সবারই রূপ, তখন বুঝবে স্ব-রূপই বিশ্বরূপ।** কেন? তোমার রূপ এতবড় হয়ে উঠবে কেন? তোমার রূপ, তোমার সত্তা চিরকালই যে ভেসে রয়েছে। সব রূপই যে তোমার রূপ ধারণ করতে পারে বা তুমিই যে সবরূপ ধারণ করতে পার, এটা বুঝাবার জন্যই বিজয়ার কোলাকুলি, আলিঙ্গন। বিজয়ার পর বিসর্জনান্তে তাই কোলাকুলি, আলিঙ্গনের প্রথা। প্রত্যেকের মূর্ত্তির সাথে তোমার চেহারাটা, ফিগারটা যেন এক হয়ে যায়। যতগুলি মূর্ত্তি আছে, সবগুলির মধ্যে তোমার রূপ ভেসে উঠছে। তোমার রূপ যখন প্রত্যেকের মধ্যে, সমস্ত বিষয়বস্তুর মধ্যে দেখতে পাবে, সেটাই পূজা। এতবড় চিন্তাধারা যখন তোমার মধ্যে কার্যকরী হবে, তখন নিজের বিরাটত্ব নিজেই অনুভব করবে। সেটাকে আনবার জন্যই আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের চেষ্টাকে সাফল্যণ্ডিত করতে চেষ্টা করছি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, যাতে সত্যিকারের কেন্দ্রস্থলে, সত্যিকারের উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে পারি। যন্ত্রের প্রয়োজন আছে। যতক্ষণ না লয়ে পৌঁছানো যায়, ততক্ষণ যন্ত্রের দরকার হয়, সা সা রে রে করতে হয়। পরে আর করতে হয় না। এই যে প্রেমপ্রীতি সব এক মিলনসুরে একত্রিত হয়। সবাই যে একই মায়ের গর্ভজাত সন্তান। সেই মাতৃপূজাই আমরা করছি। আমাদের চিন্তাধারা, প্রত্যেকের চিন্তাধারা সর্বত্র প্রতিফলিত হচ্ছে। এই পূজার অর্থ হল, তুমি তোমাকে চেন; তুমি তোমাকে জান (আত্মানম্ বিদ্ধি)। তুমি তোমার সত্তাকে খুঁজে বের কর। তার জন্যই পূজা। এই পূজার অজস্র বিধিব্যবস্থা। শ্রীরামচন্দ্র, অতবড় বিরাট মহান, তিনি মাতৃপূজা করতে আরম্ভ করলেন। তিনি নিজেই বিলীন হয়ে গিয়ে মাতৃপূজায় তন্ময় হয়ে গেলেন। তিনি নিজে আর একরূপে থেকেও খুঁজে পেলেন সেই বিরাট মাতৃরূপ। শ্রীরামচন্দ্র যখন খুঁজে পেলেন, তিনি দেখলেন নিজেরই রূপ। সেই রূপ হতেই আশীর্বাদ আসছে, ভালবাসা আসছে। শ্রীরামচন্দ্র নিজেই বুঝিয়ে দিলেন, এ যে আমারই রূপ। এটা সবাইকে তো বুঝানো যায় না। আমিই ভক্ত হয়ে আমারই পূজা করছি। আমি মায়ের পূজা করছি।

আমি নারায়ণ হয়ে, শ্রীরামচন্দ্র হয়ে যখন মাতৃপূজা করছি, সবাই যদি একনিষ্ঠভাবে চিন্তা করে, তবে নিশ্চয়ই সুফল ফলবে। তা যে হয় না, তা



নয়। এই যে সার্বজনীন পূজা হয়, তাতে কিছুটা ভেসে ওঠে। তবে চাঁদার খাতা ইত্যাদিতে বিভ্রান্ত হয়ে কিছু কিছু সরাতে যায়। তবুও প্রতি স্তরে স্তরে **এই যে ভাব 'মা আসছেন', 'মা'র পূজা করবো', তার রেশ আছে। এই ভাবটাকে উদ্ধার করতে হলে জাগরণের মন্ত্র দিয়ে জাগাতে হবে।** মহাপ্রভু যে নাম দিয়েছেন, এত মধুময় জিনিস, তাকে কাজে লাগাও। কিছু চিন্তা করতে হবে না, তোমাদের জপ, মহানাম যদি সব সময় স্মরণ করে যাও। দেখ, এমন সুন্দর জগৎ। এত পরিশ্রম করছি। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সবসময় স্মরণ করে যেও। শুধু 'দশ হাত', 'দশ হাত' বলে কাজ করে যাবে। সিনেমার দৃশ্য দেখতে যেও না। নিজেরা একত্র হয়ে যাও।

এমন অশান্তির ভিতর রয়েছি না। চারিদিকে ঝঞ্ঝাটের পর ঝঞ্ঝাট চলছে। এখন পত্রিকাতে আমি বেশী কিছু লিখছি না। এতদিন 'চাবুক' পত্রিকাতে রাজনৈতিক বিষয় ছিল। এখন (কড়া চাবুক) আধ্যাত্মিক ও বাস্তবের সঙ্গে কি সম্পর্ক, এ সম্বন্ধে আমার নাম দিয়েই লেখা থাকবে। তোমরা মন দিয়ে পড়বে। আর বেগার বকাবার দরকার কি। তাই আমাদের কি করণীয়, শুধু শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা তাই নয়, নানা রকম কথা থাকবে। সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী চলতে হবে। এদের পত্রিকা যে কিভাবে চলবে। মানুষকে জানাতে গেলে কোন্ জিনিস কোথায় আছে, জানা দরকার। কোথায় কিভাবে আছে, অল্পতে যাতে জানতে পার, সেই চেষ্টাই করছি। প্রত্যেকে ৪/৫টা করে নেবে। আমি নিজে লিখতে পারি না। আলাপ, বাক্‌শক্তি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা সহযোগিতা না করলে কি করে হবে? আমি খাটবো আর পত্রিকা এখানে স্তূপ হয়ে থাকবে, এটা কি রকম কথা? যা করবো, তোমাদেরও ভাল লাগবে। তবে গল্প টল্প নয়।

নভেম্বর, ১৫ তারিখের পর এই ঘর (পাম এ্যাভিনিউ) ছেড়ে দেওয়া হবে। উপরের ঘরটা থাকবে। ডিসেম্বর ৫ তারিখের পর কোথায় ক্লাস হবে, ঠিক নেই। একটা জায়গা ঠিক করতে হবে। ইচ্ছা আছে, আমাদের নামের সুর দেওয়ার। সবাই যাতে এই সুরে সর্বদা থাকতে পারে, সেটা করা দরকার।

সুখচর— এখান থেকে কিছুটা দূর। একটু কষ্ট করে যাবে। মোটরে ৩৫ মিনিট লাগে ৩০ মাইল স্পীডে গেলে। দেড় ঘণ্টা বাসে লাগবে। সেখানে ক্লাস ৫টার সময় যদি আরম্ভ করি, অথবা ৫টা হতে ৬টার মধ্যে যদি ক্লাস

করি, আর ৭টার মধ্যে যদি ক্লাস শেষ করি, তবে কারও ফিরে যাবার কষ্ট হবে না। এটা হাওলাত (ধার) করে করেছি। এই যে এখানে মাসে মাসে ৬০০ টাকা ভাড়া দেই, এটাই দিয়ে দিলে আমার শোধ করতে ১০/১২ বছর লাগবে। ৫০/৬০ হাজার টাকায় দিয়েছে। আমি বলেছি, 'তোমার দান আমি নেব না।' 'ঠাকুরকে বাড়ী করে দিয়েছি', এই কথার মধ্যে আমি থাকবো না। ঐ টাকাটা শোধ হলেই বাড়ীটা হয়ে যাবে। আবার বলছে, দু'চার হাজার টাকা ছেড়ে দেবে। আমি বলেছি, সেটা আলাদা কথা। তবে আমি মাসে মাসে সব টাকা দিয়ে যাব। সোদপুর এমন কিছু দূর নয়। **পাহাড় ভেঙে ভেঙে হাজার মাইল দূরে গুরুর কাছে ব্রহ্মবাণী শুনতে যেতো আগের দিনে। আর আমি নিজে পাহাড় ভেঙে তাদের বেদবাণী শুনিয়ে এসেছি।** ঐ টাকাটা আস্তে আস্তে শোধ করে দেব। আমি কারও কাছে চাইতে যাব না যে, আমায় ২০০ টাকা দাও। কষ্ট করে দেওয়ার দরকার নেই। তবে যেও কষ্ট করে।

সুখচর, জায়গাটা সুন্দরই। গিয়ে দেখে টেখে এস। একটা শিব আছে জাগ্রত। এই বাড়ীটা কেন সস্তা হয়? এটা রাজবাড়ীর ঠাকুর বাড়ী ছিল। ৮/৯ ঘর ভাড়াটে। এক ক্রিশ্চিয়ানের কাছে বিক্রী করতে গিয়েছিল। তাতেই কে যেন মারা গেল। স্বপ্ন দেখেছে, 'তুমি ওখানে বিক্রী করতে পারবে না।' তারপর আমি গেলাম। আমি যখন নেব ঠিক করেছি, ভাড়াটেরা তো উঠবে না। একটা সাপ রাত্রে ফোঁস ফোঁস করে। একজনকে ছোবল দিল। সে হাসপাতালে আছে। তারপর দিন খবর পাঠালো উঠবে ওরা। সব ভাড়াটেরা উঠে গেছে। একঘর আছে।

**মহাপ্রভু এই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কোথা থেকে কি পূজার ব্যবস্থা করি।** সুধাংশু (সুধাংশু ভট্টাচার্য্য— শ্রী শ্রীঠাকুরের মাসতুতো ভাই) বলে, 'গঙ্গার তীরে বসবো'। বললাম, 'যা ওখানে।' সে পূজা করছে। মহাপ্রভু যখন পানিহাটি থেকে এলেন এখানে, শিবের প্রতিষ্ঠা করলেন। আমি বলেছিলাম, 'দূর থেকে টান দিলে কল্কির থেকে ধোঁয়া বের হয়।' শিব খুব অল্পতেই সন্তুষ্ট। তাড়াতাড়ি যদি উদ্ধার পেতে চাও, তাঁর কাছে যাও। শিবের কাছে গেলে তাড়াতাড়ি উদ্ধার হয়ে যাবে। ঠিকানা টিকানা নিয়ে যেও। আজ এই থাক।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*



# তোমরা মুক্ত জায়গায় থেকে মুক্তির সাধনা করছো

**বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাস, শিবপুর-হাওড়া**
**৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১**

প্রকৃতির অনন্ত ধারাবাহিকতার ধারায় রূপের মাঝে, জীবের অন্তর্নিহিত সত্তায়, বুঝের সাড়ায় সৃষ্টি হয়ে চলেছে এই জীবজগৎ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। রূপে রূপে রূপান্তরিত হতে হতে অসীম অনন্ত গতির সুরে সুরে ছুটে চলেছে জীবকুল; ছুটে চলেছে মহাশূন্যের বুকে গ্রহ, নক্ষত্রপুঞ্জ। প্রতিটি রূপের মাঝে খুঁজে পাই অরূপের সাড়া। আবার খুঁজতে খুঁজতে নিখোঁজের মাঝে হারিয়ে যেতে হয়, হারিয়েই যেতে হয়।

জীবজগতে প্রতিটি জীবের মাঝে বা মানুষের মাঝে খোঁজ করতে গেলে কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। **এই জীবজগৎ কে সৃষ্টি করেছেন, স্রষ্টা কে? আমাদের মাঝে কে বোঝে, কে উত্তর দেয়? কোথায় তিনি? তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁকে পাওয়া যায় না। আমরা এর মীমাংসা চাই।**

ভালভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, দেহের সব কিছু চাহিদা প্রকৃতি থেকে মিটিয়ে দিচ্ছে। ভিতরে প্রশ্ন যখন জাগছে, মীমাংসা আছে বলেই জাগছে। সেই মীমাংসার পথ, সেই সমাধানের সুর খুঁজে বার করতে হবে। জীবনের পথে অতি সহজভাবে থাকলেও অঙ্ক না মিললে কঠিন হয়ে যায়। আমরা ভিতরের বুঝটা দিয়ে সব বুঝতে পারি। এই বুঝটা এমন একটি প্রকৃতির যন্ত্র, তার কাজই হল বুঝিয়ে দেওয়া। আমরা বুঝতে বুঝতে জানার পথে জানতে জানতে এগিয়ে চলেছি। তারপর চলার পথে কোনটি ফেলে দেওয়া হবে, কোনটি বা গ্রহণ করা প্রয়োজন, সেটা হ'ল পরবর্ত্তী কথা। **বুঝের যন্ত্রটি ভিতরে ঠিকই বুঝিয়ে দেয়। সে হ'ল প্রকৃতির সজাগ প্রহরী। যে কোনও কাজ কর না কেন, তা সে পাপই হোক আর পুণ্যই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। বুঝ ঠিক বুঝিয়ে দিয়ে যায়।** কচ্ছপের মাথা কেটে ফেলেছে। মুখে জল দিচ্ছি, হাঁ করছে। পাগুলি নাড়াচ্ছে। মাথা নাই; দেখছে

ওর দেহ নাই। সবই বুঝতে পারছে। ওর পায়ে হাত দিলে লাথি মারছে। ব্যথা পাওয়া, জল খাওয়া, মাটি কামড়ে ধরা, কোন্‌টা কি বুঝতে পারছে। এতে বুঝের কাজই হচ্ছে; বুঝের বিকাশ হচ্ছে। মাথা নেই বলে সহজগতিতে প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে। উপলব্ধি নেই। মাংসের টুকরোগুলি নড়েচড়ে উঠছে। তখন এরমধ্যে কে আছে? কিন্তু তখনও একটা গতি আছে। দেহের যন্ত্রটা কেমন, চিন্তা করে দেখ। সমুদ্রে একরকম মাছ আছে, তার নাক চোখ, মুখ কিছু নেই। তাকে যদি একশো টুকরো কর, প্রত্যেকটি টুকরো জীবন্ত থাকবে এবং দেখবে, প্রত্যেকটি টুকরো এতবড় হয়ে গেছে। কি করে হলো?

নিদাঘের রাগে নদ নদী, সমুদ্রের জল যখন বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, বুঝা তো যায় না। আকাশের বুকে কত সমুদ্রের জল যে মিশে রয়েছে, ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এই জল যখন নীচে পড়ে, বুঝিয়ে দেয়, সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের দেহে এমন একটি সত্তা আছে, আকাশ থেকে এমন একটি সত্তা পেয়েছি, যার নাম বুঝ; যা রূপের প্রকাশ করার জন্য সদা অন্তরে বিরাজমান। এই বুঝই সবকিছু জানিয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয়। তোমার মূলধন দিয়ে তুমি কি করবে, কি তোমার কর্তব্য, সেটা নিরূপণ করবে তুমি। বাবার তিন ছেলে। মৃত্যুকালে তিন ছেলেকে এক লক্ষ টাকা করে তিনি তিন লক্ষ টাকা দিলেন। একজন স্ফূর্তি আর আমোদ-প্রমোদে সব টাকা উড়িয়ে দিল। আর এক ছেলে নিজের এক লক্ষ টাকাকে মূলধন করে কোটি কোটি টাকা করলো। **তোমাদের ভিতরের বুঝ যার যার মূলধন। সেই মূলধন দিয়ে তোমরা যা খুশী করতে পার। আগেই বলছি, এটা প্রকৃতির যন্ত্রবিশেষ। এই বুঝ জানিয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয়। কাজেই ভাল-মন্দ যা কিছু করছো, সব তুমি জেনে বুঝেই করছো। তোমার কর্মের ফলাফলের জন্য জগতের আর কেউ দায়ী নয়। তুমি নিজেই দায়ী।** এই দেহযন্ত্রের নখ থেকে চুল অবধি বুঝ আর সাড়ায় ভরা। বুঝ আছে বলেই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই নিজ নিজ কাজে সজাগ। তোমরা জীবনের চলার পথে বুঝ দিয়েই বুঝকে বাড়িয়ে যাচ্ছ। এই বুঝ (জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক) যখন জগৎ (প্রকৃতি) থেকে দিয়ে দিয়েছে, আমাদের মূল্যবান জীবনের অনেক কিছুই নির্ভর করছে এর উপর। প্রকৃতির মুক্ত বাতাসে কত জীবানু ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের মাঝে কোন্‌টা শত্রু, কোন্‌টা মিত্র জানি না। বাতাসের মধ্যে সাপের মত সূক্ষ্ম জীবাণু



আছে। দেখলে শ্বাসে প্রশ্বাসে টানতে ভয় হতো। মনে হতো, কি করে বাঁচবো? তবুও তো আমরা বেঁচে আছি। মৃত্যুমুখে নিয়ে যাওয়ার জন্য শত্রু আছে অনেক। জলে, বাতাসে কত বিষ্ঠা, কফ-কাশির গুঁড়া মিশানো আছে। মানুষ বাঁচে একটা কারণে। কারণ আমরা মুক্তাকাশের তলায় আছি। সেথায় জীবাণুরূপ শত্রুগুলি নিস্তেজ হয়ে আছে। মুক্ত জায়গায় থাকলে সবকিছু থেকে, জীবাণুর অন্তরায় থেকে মুক্ত হওয়া যায়। মুক্ত জায়গায় বাস কর। জানালা, কপাট সব খুলে দাও। জীবন ধারণের পক্ষে মুক্ত বাতাস অত্যন্ত উপকারী।

স্বভাবতঃই মন চঞ্চল। রোগে শোকে নানাভাবে জর্জরিত। জীবনের পথে চলতে চলতে সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে নিম্নগতিতে যাওয়ার দিকেই সহায়তা বেশী পাওয়া যায়। ঊর্দ্ধে যাওয়ার সহায় কম। এই নিম্নগতি কি করে এড়ানো যায়? হিংসা দ্বেষ, ছল কৌশল, আঘাত, খুন করার বুদ্ধি, ক্লেদ পঙ্কিলতা থেকে কি করে মুক্তি পাবে? এর জন্যই রয়েছে মুক্ত আকাশ। ঊর্দ্ধে যাওয়ার একমাত্র উপায় মুক্তধ্বনি। মুক্ত আকাশে যে গর্জন হয় বর্ষণের জন্য, সেই বর্ষণ শান্তির প্রতীক। প্রবল বর্ষণে ভেসে যাওয়ার পর প্লাবনের শেষে পলিমাটি আসে। জমির উর্বরা শক্তি ফিরে আসে। সেই জমিতে ফসল ফলালে ধরণী হয় শস্যশ্যামলা। **মহাধ্বনির ধ্বনি দিলে একমাত্র মহাকাশের সুরে যুক্ত হওয়া যায়। বুঝ বুঝিয়ে দিচ্ছে এর মর্ম কথা। বুঝ বাড়াতে চাও তো ধ্বনির সাথে হাত মিলাও। ধনী হতে হলে ধ্বনির সাথে হাত মিলাতে হবে।** একমাসের শিশু কি কথা বোঝে? তোমার ভিতরের বুঝে তখনকার অবস্থার সাথে মিশতে মিশতে এসেছ। প্রত্যেকের ভিতরে বুঝটা আছে যন্ত্র হিসাবে। এই মূলধন নিয়ে তোমরা এগিয়ে আসছো। হাত, পা সংযত করতে শিখেছ। কথায় বার্তায়, আচারে আচরণে সংযত হতে শিখেছ। বুঝের যন্ত্র যত চালাবে বুঝ পাকবে। অনন্ত বিশ্বের পথে চলতে আর কষ্ট হবে না।

আকাশগত মন নিয়ে চল। আকাশের ধ্বনির সঙ্গে সুর মিলিয়ে দাও। সেই সুরে বাঁধা বুঝকে অনন্ত বিশ্বের সুরের সাথে এক করে জীবনের সুর মিলাতে হবে। তোমরা যা খুশী কর, ক্ষতি নেই। কিন্তু বুঝের বুঝটি যেন ঠিক থাকে। এই বুঝ যখন আকাশ থেকে আসছে, সে (বুঝ) গভীরতম অবস্থায় চলে যেতে চায়; অসীম অনন্তে মিশে যেতে চায়। **প্রকৃতির এই মহাদান**

**নিয়ে, এই বুঝ নিয়ে ছিনিমিনি খেল না। অযথা সময় নষ্ট করে মূল্যবান সময়ের অপচয় করো না। প্রত্যেকে নিজস্ব গতি নিয়ে চলবে। প্রত্যেকের নিজস্ব সত্তা থাকবে।**

মহাকাশের মহানামই হলো সুর, নামই হলো বুঝের একমাত্র সুর। এই পথেই এগিয়ে যেতে হবে। সব সুরকে এক সুরে বেঁধে ধ্বনির মাঝে ছেড়ে দাও। সব কিছু বুঝের মাঝে ছেড়ে দাও। বাহ্য অনুভুতি থেকেই অন্তর অনুভূতি আসবে। মহাকাশের মহানাম মহাস্বরগ্রাম 'রাম নারায়ণ রাম'; এই নামের সাথে, এই ভাবের সাথে সব ভাবনা মিশিয়ে সব বিষয় জানিয়ে আনন্দের পথে চলতে হবে। তোমরা মুক্ত জায়গায় থেকে মুক্তির সাধনা করছো, মনে রাখবে। আজ এই থাক।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*



# নিজের সম্বলটুকু গুছিয়ে নাও। একদিন আমার কথা কাজে লাগবেই। এখন ভাল না লাগতে পরে। পরে আফশোস করতে হবে।

**পুরী**

**৩০শে আগষ্ট, ১৯৫৩**

এই পরিদৃশ্যমান জগতে সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারায় প্রতিটি সৃষ্টজীবেই সর্বশক্তি বিদ্যমান। জীবের অন্তর্নিহিত শক্তি, না জানলেও নানা পরিচয়ের ভিতর দিয়ে তার স্ফূরণ হয়ে যাচ্ছে। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে রূপে রূপে চলেছে যে পরিবর্ত্তনের ধারা, তাতে দেখা যায়, দশ রকম পদার্থের সংমিশ্রণের ধারা নিয়েই এক একটি রূপ। বিভিন্ন নাম নিয়েই এক একটি নাম। প্রতি মুহূর্ত্তে বিভিন্ন নড়াচড়া, বিভিন্ন ভঙ্গীতে যা কিছু হয়ে চলেছে, তা সেই এক বিশ্ববিরাটেরই বিকাশ। রূপে রূপে এত যে বৈচিত্র্য, সেই বিভিন্ন রূপ একেরই রূপ। সেরূপ ছাড়া আমরা কেউই নই।

**রোগ, শোক, দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা প্রতিটি জীবের মাঝেই বিদ্যমান; স্রষ্টার সৃষ্ট বস্তু সমূহে এগুলি বিভিন্ন শক্তির বিকাশ। বরফ তারও একটা যন্ত্রণা আছে, আগুন তারও এক যন্ত্রণা আছে। সমভাবে জ্বালাগুলো একটি নিয়মমাফিক হিসাবে চলে আসছে।** সৃষ্টি বিরাট। সৃষ্ট বস্তু সমূহের মাধ্যমে স্রষ্টা যেন নিজের সাথে নিজে কথা বলছে। সৃষ্টির এই যে বৈচিত্র্য, এই যে সমস্ত বৈষম্যভাব, বিরাটেরই এক এক অবস্থা, একই শক্তির নানা রূপে বিকাশ। এখন বোধগুলো নিতে নিতে আমরা এমন বোধে এনে ফেলেছি যে, একত্ববোধ ছেড়ে দূরত্ববোধে চলে গেছি। প্রকৃতির ধারাবাহিকতার ধারায় আমরা এমন ব্যায়াম করতে চাই, যাতে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটি নিয়মমাফিক হিসাবে চলবে। এক জায়গায় বসে বিভিন্ন বিভিন্ন যে উপলব্ধি, তাতে এটাই বুঝিয়ে দেয়, একই শক্তির বিভিন্নরূপে বিকাশ। নানা পরিচয় সবভাবেই প্রকারান্তরে একেরই ভাব। পার্থক্যবোধ এক এক শরীরের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে মননে স্মরণে চিন্তায় ভাবনায়।

বদ্ধ ঘরের টবের গাছ, সে-ও ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে আলোর সন্ধানে মুক্তির জন্য এগিয়ে যায়। আজ আমরা বদ্ধ ঘরের অবস্থা তৈরী করে নিয়েছি। তবুও এমন কিছু চাইছি, যাতে সব দুঃখ জ্বালার উপশম হয়ে যায়। আমরা প্রকারান্তরে পরম শান্তি, পরম তৃপ্তির কামনা করে চলেছি। **নানা কারণে নানা পরিস্থিতিতে বিবেকের বিরুদ্ধ কাজে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি এক এক অবস্থার চাপে। তারপরেই জ্বালায় যন্ত্রণায় অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হতে চাই উপশম।উপশম আমরা চাচ্ছি, মুক্তি চাচ্ছি, শান্তি চাচ্ছি। প্রকারান্তরে আমরা সাধনা করেই যাচ্ছি। আমাদের সাধনা হচ্ছে উপশমের সাধনা।** কাজেই যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, একটা উন্মাদনায় এগিয়ে যাচ্ছি শান্তির দিকে।

বিরাটকে উপলব্ধি করাই হ'ল বিরাট শান্তি। সেই চাওয়ার পিছনে মনে হচ্ছে একটা সুর বয়ে যাচ্ছে। সেই সুর হ'ল আদি সুর। আদি সুরের সাধনাই দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা হতে উপশমের সাধনা। এই উপশমটা বিরাট শান্তির সুর, সেই আদি সুর। সেই সুরকেই আমাদের সুরে আনতে হবে। তাহলেই বিরাট শান্তি পাব। এখন চলেছে Crisis অবস্থা। হিংস্র ব্যাঘ্র ভেড়ার দলে মিশে ঘাস খেতে শুরু করেছে। আমরা আমাদের বিরাটত্ব ভুলে, নিজের স্বরূপ ভুলে সংকীর্ণ স্বার্থ, হিংসা নিয়ে মেতে রয়েছি। **ব্যাঘ্র রক্তের স্বাদ পেলেই স্বমহিমায় জেগে উঠবে। আর আমাদের যদি মন্ত্রের স্বাদ দিয়ে দেওয়া যায়, ব্রহ্মত্ব পেতে দেরী হবে না।**

মন্ত্র আমাদের বিরাট; শক্তিও তার অসীম। প্রত্যেকের মাঝে মন্ত্রকে জাগরিত করে নিতে হবে। যেমন সাগর আর নদী, একই সূত্রে গাঁথা। চলার পথে সাগরের সাথে মিলিত হবার দুরন্ত গতিতে বিভিন্ন স্থানে নদী বিভিন্ন নাম নেয় কেবল। প্রত্যেকটি লোকই অবতীর্ণ। মহানদের মহত্ত্ব নিয়েই প্রত্যেকের জন্ম। তাহলে অসুবিধা কোথায়? এখন একটু দরকার গাঁটটুকুনু ছুটিয়ে নেওয়া। **দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ডিনামাইটের সাহায্যে পাহাড় ফাটানো হয় যেমন, ঠিক তেমনি মন্ত্রের শক্তিতে মন্ত্রের তাপে ভিতরের গ্ল্যাণ্ডগুলোকে জাগ্রত করতে হবে।** রূপ বুঝলে স্বরূপ বুঝতে আর দেরী হয় না। এই উদ্ভব এবং উদ্ভবত্ব যে কোনও ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। এখন ব্রহ্ম নাম অসোয়াস্তি স্বরূপ। সব কিছুতেই কেমন অস্বস্তি দাঁড়িয়ে গেছে। কাজেই আমাদের স্বস্তির সাধনা করতে হবে। তবেই আসবে আত্মতৃপ্তি।

আমাদের চলন শক্তি, মননশক্তি ঠিকই আছে। বুঝি আর না বুঝি, শক্তির



বিকাশও ঠিকই হয়ে যাচ্ছে। ঘরের এক কোণে মিষ্টির কণা পড়ে থাকলে পিঁপড়া ঠিকই তার স্বাদ পায়। আর সর্পকে আঘাত করলে বহুদূরে যেয়ে দংশন করে আসে। এই সব জীবের মধ্যে যদি এত সব শক্তি থাকে, তবে আমাদের ভিতর দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণের আর অসুবিধা কি?

পারবো এবং পারবো না অবস্থা আসতে একই একাগ্রতা শক্তির সাধনা দরকার। কাজেই এই দুই অবস্থা একই শক্তির দুই ক্রিয়া; একই শক্তির দুই খেলা। একই জিহ্বাতে যেমন মিষ্ট স্বাদ বা তিতা স্বাদ পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি। শুধু বুঝতে হবে। তখন বুঝ বুঝবে বুঝটুকুনুকে।

**আমাদের সম্মুখীন হয়েছে কুয়াশা। এখন দরকার সূর্যের তাপ। কাজেই জ্যোতির ধ্যান, সূর্যের আলোর ধ্যান করে যাব। তবেই আলোর দেখা পাব। আবার সৃষ্টিতে অন্ধকারেরও দরকার আছে। নতুবা আলোর অবস্থায় আসা যায় না। আলোই আমাদের একমাত্র সাধনা।** আলোই জ্যোতি। জ্যোতিতেই আমরা সৃষ্ট। জ্যোতিদ্বারাই আমরা সৃষ্ট।

একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে, তা দিয়ে যেমন সমস্ত দুনিয়া জ্বালিয়ে দেওয়া যায়, ঠিক সেভাবেই আমাদের ভিতরের ৯৬ ডিগ্রী, ৯৭ ডিগ্রী তাপ দিয়েই আমাদের সব আলোকিত করতে হবে। ভিতরের সুপ্ত শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। তোমার ভিতরে যে অজস্র অজস্র সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী রয়েছে, তখন তা বুঝবে। এখন আশ্চর্য মনে হলে কি হবে, সেই বিরাট রূপই তোমার রূপ হয়ে যাবে। কি অদ্ভুত।

ব্রহ্ম নিজেকে নিজে জানার জন্যই প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করে চলেছেন। নিজেকে নিজে জানাবার জন্যই এই প্রচেষ্টা, এই বিরাট মারামারি ও লড়ালড়ি। সেজন্যই এই বিরাট সৃষ্টি। প্রতি মুহূর্তে বুঝবার জন্যই সে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

বেড়াজালের সাধনাই আজ আমরা করে চলেছি। **পাখী খাঁচায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে যেমন খাঁচাতে থাকাটাই মুক্তির অবস্থা বলে মনে করে। তবে পাখীর ডানার এবং শরীরের ব্যথা সেরে গেলে মুক্তির আনন্দে পাখী আবার উড়বে। সাধনাতে মগ্ন থাকলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হউক, সফলতা অনিবার্য।**

তোমরা মুক্তির গান গাইছো। সেই গীতের সুরের সাথে সুর মিলিয়ে নিতে হবে। আঘাত প্রত্যাঘাত বিরাটের গতিপথের পথে আমাদের সহায়ক। রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যাধি সেই বিরাটের সুরের সাধনায় একমাত্র সহায়কের কার্য করছে।

এই দেহবীণাযন্ত্রে প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় যার যার তৃপ্তির সাধনা করছে। তারা যেরূপ তৃপ্তির সাধনা করছে, আমরাও সেরূপ করছি। সেই তৃপ্তির খণ্ড খণ্ড রূপ হতে আমরা অখণ্ডের দিকে যাচ্ছি। সমস্ত ইন্দ্রিয় একত্রিত হয়েই সুস্বাদু ব্যঞ্জনে পরিণত হয়; জ্ঞান, বিবেক, বিচার জেগে ওঠে। সেই জ্ঞানই আমাদের একমাত্র সাধনা। সংসারের নানা আবিলতার মাঝেই জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেককে জাগ্রত করতে হবে। **যত বাধা আসবে, ততই বুঝবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। ঝড় ঝাপ্‌টা না থাকলে সুখে দুঃখে আমরা পঙ্গু হয়ে যেতাম।**

**আমরা বিরাটকে জানতে যাচ্ছি মূলমন্ত্র বা মূলবাণীর সাহায্যে। আমরা জয়ের খেলা করছি, আমরা পরাজিত হতে পারি না। যে জিনিস জানলে সব কিছু হয় জানা, সেই অবস্থায় গেলে রোগ, শোক, দুঃখ সব পালিয়ে যাবে।** কোন ব্যবসায়িক বুদ্ধিতে আমাদের সাধনা নয়। আমাদের সাধনা বিরাটের সাধনা। স্বাধীন কে? নিজেকে যে সম্পূর্ণ বশে আনতে পারে, তখনই সে স্বাধীন। দেশ তখন এমনিতেই স্বাধীন হয়ে যাবে। আমরা এগিয়ে যাব জাগরণের দিকে অর্থাৎ জাগ্রত বস্তু যে সম্মুখীন আছে, তারদিকে। আজ হীরক (Diamond) আমাদের সম্মুখীন। এই সব কয়লা নোংরা নয়। এই নোংরা শুধু বাচ্চা ছেলের প্রস্রাবের অবস্থা। কাদা ছেনে ছেনে মাটিটাকে মসৃণ করে নিতে হয়। তারপর সেই মূর্ত্তিকেই পূজা করে "শবারূঢ়াং ..... ।" সেই মূর্ত্তিকে পূজার মাধ্যমে মূর্ত্তিকার (কুমোর) তখন নিজের পূজা নিজে করছে।

আমরাও সেইরূপ নিজেকে গড়াচ্ছি। সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে, বৃত্তির নিবৃত্তির সাধনায় বিবেকের সুরে সুরে নিজেকে গড়ে নিতে যদি পারি, তখন আর পাথরের মূর্ত্তির দিকে যেতে হবে না, আমার মূর্ত্তির দিকেই আমি দেখবো। রান্না আমরা শিখে গেছি। টোফামুচির (খেলনা রান্নার বাসন) আর দরকার হবে না। মূর্ত্তিকে সম্মুখীন করে, আমরা নিজেদের গড়ে তুলছি, জাগিয়ে তুলছি। তাই মূর্ত্তি আমাদের কাছে আয়নার সামিল (দর্পণ স্বরূপ)। আমরা নিজেকে হারাইনি। কেবল সাময়িক কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি।

বিরাটের সুরে জানার পথে জানতে জানতে আমরা এগিয়ে চলেছি। অনিবার্যভাবে আমরা জানবই। সাধনা সেখানেই সফল হবে। বিরাটের সুরের সাথে, বিবেকের সুরের সাথে যে সুর মিলিয়েছে, সে-ই মহান নাম নিয়েছে। শ্রেণী ছাড়া কেউ নয়। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র যেমন একই হাইস্কুলের লম্বা বেঞ্চের সুরে গাঁথা আছে, আমরাও তেমনি প্রকৃতির বিদ্যালয়ে



বিভিন্ন শ্রেণীতে আছি। শ্রেণীতে যে আমরা আছি, এই উপলব্ধিটা শুধু দরকার। **কেহ ১ম, কেহ ৫ম, কেহ বা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। শ্রেণীতে সবাই; শ্রেণী ছাড়া কেউ নয়। মহানরা, যাঁরা আসেন, তাঁদের স্পর্শে আরও উপরের শ্রেণীতে তুলে নেন।**

বুঝ খাঁটি থাকলে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি মহান ব্যক্তি বহুকে টেনে নিতে পারেন, যেমন একটা ইঞ্জিন টেনে নেয় বহু মালগাড়ী। সত্য ও জ্ঞান ভিতরে প্রতিষ্ঠিত থাকলে অজস্র অজস্র টেনে নেওয়ার ক্ষমতা থাকে; আলকাতরা হতে পিচ পর্যন্ত। সব সহজ ও সরল মন নিয়ে চলার জন্য আমাকে অনেক গালি ও বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। ভাবতাম, প্রলোভন যদি মনে মনেও একটু প্রশ্রয় দেই, তবে আমি কলুষিত হয়ে যাব। সে জন্যই সরলতা ছেড়ে দেই নাই।

গুরুশরণাগত না হলে অর্থাৎ ইঞ্জিন আর বগী একসঙ্গে না করে দিলে, এক যোগাযোগে যুক্ত না হলে নিতে অসুবিধা হয়। অতি কঠিন বস্তুকে তরল করে দেওয়াই জ্ঞানবান ব্যক্তির কাজ। জ্ঞানরূপ আগুণ সমস্ত কিছুকে সঠিকতার সুরে নিয়ে আসে। জ্ঞানরূপ আলোকই আমাদের সাধনার বস্তু। অতি ধারালো অস্ত্রও অব্যবহারে মরিচা পড়ে অকেজো হয়ে যায়। দরকার শান দেওয়া (ধারালো করা)। **আমাদের ভিতরকার পাঁঠা, মহিষরূপ অজ্ঞানতার রিপুগুলিকে নষ্ট করতে হবে, খণ্ডন করতে হবে জ্ঞানরূপ অস্ত্রের দ্বারা। কঠিন যখন তরল হবে, তখনই বুঝবে, তোমার সত্যে তুমি প্রতিষ্ঠিত আছ। জীবন অবসানের সম্মুখীন। সময় নষ্ট করার সময় নেই। কুয়াশায় যাতে ঘিরে না পড়, তা দেখে দেখে যার যার সম্বল খুঁজে নিতে হবে।**

সাম্যে সৌন্দর্যে সত্যে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত যিনি তিনিই গুরু হতে পারেন। অর্থ থাকবে প্রয়োজনের তাগিদে; শুধু মিটিয়ে নেওয়ার জন্য যেটুকু দরকার ততটুকু।

**নিজের সম্বলটুকু গুছিয়ে নাও। একদিন আমার কথা কাজে লাগবেই। এখন ভাল না লাগতে পারে। পরে আফশোস করতে হবে। কারণ আমি ধর্মের দেশ বা সত্যের দেশে বিচরণ করি। আমি তাদের জন্যই বেরিয়ে পড়ি, যারা একটু এগিয়ে আসে।**

আমি হারানোর মাঝে হারিয়ে রয়েছি, তাকানোর দিকে তাকিয়ে।

সেই রূপ তোমরা সূর্যমুখী ফুলের ন্যায় দিক ঠিক রেখে এগিয়ে চল।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*

## -ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, রেখা মিত্র, ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) জয়ন্ত দে, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোলকাতা-৫, ফোন - ২৫৩০-৪৮০৭
৪) সৌরীন্দ্র নাথ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬, ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) বিনয় মোদক, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) গৌর মুখার্জী, ১১/৫, পর্ণশ্রী, বেহালা, কোল - ৩৪
ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) কোলকাতা বইমেলা।
৮) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন ঃ- ৯২৩২৬৮৪২৫৯
৯) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা - ৭০০০৮৪
১০) ভোলাব দোকান, কালনা গেট, বর্ধমান, ফোন - ৯৪৭৪৬৯৫৬৫৪
১১) বলরাম, ৩৪ এস. কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮
১২) Lakshindhar Das, Dularpar, P.O.- Makhanpur
Dist.- Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১৩) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৪) সুভাষ ঘোষ বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন ঃ- ০৩৬৬৭-২৫১১৭৯
১৫) তরুন/ইরা জোয়ারদার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২৪৫১৯
১৬) রমা নাথ মহন্ত, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ০৯৭৩৩৩৩৯৪৩২
১৭) উত্তম চ্যাটার্জী — নিয়ামতপুর, সীতারামপুর, ওয়েন্ট এন্ড, জি.টি.রোড,
আসানসোল, ফোন ঃ- ০৩৪১-২৫১৫০৬৬
১৮) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯

## -ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

## -ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

## অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

| পুস্তক পরিচিতি | প্রকাশকাল |
|---|---|
| ১) বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন | শুভ মহালয়া, ১৪১১ |
| ২) মৃত্যুর পর | শুভ মহালয়া, ১৪১১ |
| ৩) পরপারের কান্ডারী | শুভ বড়দিন, ১৪১১ |
| ৪) সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু | শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১ |
| ৫) অঙ্গীকার | শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২ |
| ৬) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি | শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২ |
| ৭) বীজ ও মহাসৃষ্টি | শুভ মহালয়া, ১৪১২ |
| ৮) শুভ উৎসব | শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২ |
| ৯) তত্ত্বসিন্ধু | শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২ |
| ১০) দেহী বিদেহী | শুভ নববর্ষ, ১৪১৩ |
| ১১) পথপ্রদর্শক | শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩ |
| ১২) অমৃতের স্বাদ | শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩ |
| ১৩) বৈদিক বিপ্লব | শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩ |
| ১৪) সুরের সাগরে | শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪ |
| ১৫) পথের পাথেয় | শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪ |
| ১৬) জন্ম মৃত্যু রহস্য | শুভ মহালয়া, ১৪১৪ |
| ১৭) মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর | শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪ |
| ১৮) আলোর বার্তা | শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪ |
| ১৯) কেন এই সৃষ্টি | শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫ |

## 'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪